ক্ষুদ্র ও বৃহৎ

দ্বিতীয় খণ্ড

রাণী বিশ্বেশ্বরী

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়ের রচিত।

কলিকাতা
২নং বেথুন রো, ভারতমিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানী হইতে
শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৩০৩ সন

মূল্য ৸০ আনা

বিজ্ঞাপন।

নানা সময়ে নানা মাসিক সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত আমার কয়েকটি প্রবন্ধ লইয়া কলিকাতার শ্রীযুক্ত সেন ব্রাদার্স্ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নামে এক খণ্ড পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। সেটি প্রথম খণ্ড। এই দ্বিতীয় খণ্ডেও মাসিক সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংশোধিত ও একত্র করা হইল। দেশে বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠা নামক রচনাটি বর্দ্ধমান বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ। ইহাও মাসিক সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

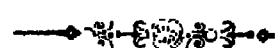
এই পুস্তকে কয়েকটা বাঙ্গালা অক্ষরের প্রচলিত আকার সহজ করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণে সবিস্তর বলা গিয়াছে। ইতি—

বাঁকুড়া
১৩৩৩ সাল, আষাঢ়

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

সূচীপত্র।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ



রাণী বিশ্বেশ্বরী

পৌষ মাস, শীত পড়িয়াছে। বৈকালে ফোঁটা কয়েক বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, শীত বাড়িয়াছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, বাতাস বহিতে লাগিল। শীতে বসিয়া থাকিতে না পারিয়া সকাল সকাল দুটি খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ শুইয়াছি কে জানে; দেখি এক নূতন শহরের চৌমাথায় দাঁড়াইয়া আছি। জ্যোৎস্না রাত্রি; রাস্তার দুই পাশে আলোও জ্বলিতেছে; তবু বড় বড় দোকানের ছায়ায় আলো তেমন খোলে নাই। তেমন শহর কখনও দেখি নাই। মণিকার ও স্বর্ণকারের বড় বড় দোকান, শাল-দোশালার দোকান; বোধ হইল এত ধন একত্র কলিকাতাতেও দেখি নাই। পথে লোক-জন চলিতেছে। তাহাদের মাথায় টুপী ও কাপড় চোপড়ের ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল, পশ্চিম দেশ হইবে। এক জনকে সুধাইলাম,—

'মশায়, এদেশের নাম কি?'

লোকটি খানিকক্ষণ আমায় আপাদমস্তক দেখিয়া জিজ্ঞাসিল,—

'আপ্, কাঁহাকে রহনেবালে হ্যায়?'

'কটক।'

'ক্যা—চাটাক্?'

আমি মনে মনে তাহার শ্রবণ-যন্ত্রের প্রশংসা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম,—

'ক-ট-ক।'

'র কৌন্ মুল্‌ক হ্যায় ?'

মনে হইল, বলি, মগের মুলুক। কিন্তু লোকটির বেশাভূষা ভদ্রলোকের। বোধ হয় বাল্যকালের বিদ্যালয়ের 'ভূগোল-বিবরণ' ভুলিয়া গিয়াছে। নইলে, কটক নাম শোনে নাই! এত বড় শহর, দীর্ঘে ছ মাইল, প্রস্থে দেড় মাইল; এক পাশে মহানদী, অন্য পাশে কাঠ-জুড়ী নদী; পঞ্চাশ হাজার লোকের বাস; এসব কিছু শোনে নাই! ওড়িষ্যা দেশটা শুনিয়াছে কি না, কে জানে।

'আমার নিবাস ওড়িষ্যা।'

'জগর্নাথ-জীকো মুল্‌ক ?'

আমি মাথা নাড়িয়া হাঁ জানাইয়া বলিলাম, 'আমার মুলুক ত জানিলেন; আপনার মুলুকের নাম কি ?'

'আপ্‌নে দিল্লী শহর দেখা নহিঁ ? রাজধানী হ্যায়।'

লোকটি চলিয়া গেল। শহর দূরে থাক, আমি দিল্লীর লাড্ডুও চোখে দেখি নাই। কিন্তু প্রাচীন গৌরব মনে পড়িতে লাগিল। কোন্ পুরাকালে, সাড়ে চারি হাজার বছর পূর্বে, হস্তিনাপুরে কৌরব-রাজধানী ছিল; ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবকুলতিলক যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ হইয়াছিল, সে বিভবের সে ঐশ্বর্যের তুলনা নাই। কিন্তু পরস্পরের ঈর্ষা-দ্বেষে মাত্র আঠার দিনের যুদ্ধে চল্লিশ লক্ষ সেনার প্রাণ লইয়া কুরুক্ষেত্র শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। কত কাল পরে মুগল বাদ্‌শাহ সে শ্মশান-স্তূপে সিংহাসন স্থাপন করেন। ইহাঁদেরও ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। এখনও শা-জেহান বাদশাহের বিস্তীর্ণ প্রাসাদ অতীত বিভবের সাক্ষী হইয়া আছে। তাহাঁর জমা-মস্‌জিদ্ ভারতে অদ্বিতীয়। কালা মস্‌জিদ্ ও কুতব-মীনার আছে বটে; কিন্তু সমৃদ্ধির ভগ্নস্তূপ অধিক। পাশের কালিন্দী কাল-তনয়া হইয়া যুগযুগান্তরের উত্থান-পতনের অভিনয় দেখিয়া আসিতেছে।

কিন্তু এত সব দেখিবার ভাবিবার সময় কই? দুই চারিটা উদ্যান দেখিতে না দেখিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ প্রায় মাথার উপরে উঠিয়াছে; বুঝিলাম রাত্রি প্রায় বারটা। এক উদ্যানের চত্বরে বিশ্রামের অভিপ্রায় করিতেছি, দেখি এক প্রখর আলোকচ্ছটা ঊর্ধ্বদিগে নির্গত হইতেছে, তাহাতে চাঁদের আলো মিটি-মিটি করিতেছে। নিকটে গিয়া দেখি একটা বাপী আলোতে ভরা! এটা কি নূতন রাজধানীর আলো-ঘর?

বাপীর ভিতরে তাকাইয়াছি, প্রখর সূর্যের মতন কি বোধ হইল, চোখে আঁধার দেখিলাম, পা খসিয়া গেল, বাপীর ভিতরে পড়িয়া গেলাম। ভাগ্যে ভাগ্যে মাথা ঘুরিয়া পড়ি নাই! নিমেষের মধ্যে এক দীর্ঘ সুড়ঙ্গের সে পারে গিয়াছি, মাথাটা মাটিতে লাগিয়াছে, পা দুখানা শূন্যে ঝুলিতেছে। তাড়াতাড়ি ডিগ-বাজি খাইয়া মাটিতে পা দিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু ফাঁড়া এখনও কাটে নাই। মাথাটা নীচের দিকে ঝুলিতে লাগিল! আশ্চর্যের কথা, সূর্যও মাথার নীচে! চাহিয়া দেখি দেশের গাছগুলা নীচের দিকে ডাল মেলিয়া ঝুলিয়া আছে, গগনস্পর্শী পঞ্চাশ-তলা ষাইট-তলা লোহার অট্টালিকা সেইরূপ শূন্যে লম্বিত রহিয়াছে। সে দেশের লোকগুলাও বিস্তীর্ণ রাজপথে আমারই মতন মাথা নীচে রাখিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছে। অদ্ভুত দেশ বটে; রক্ষা, লোকগুলাকে ইংরেজ ইংরেজ বোধ হইল। এক জনকে জিজ্ঞাসিলাম,—

'মহাশয়, আপনাদের দেশটির নাম কি?' লোকটি ভদ্র, তথাপি আমায় আপাদমস্তক কেন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, বুঝিলাম না। নিজের দেহের দিকে তাকাইয়া দেখি পরণে ধুতি ও গায়ে ছোট জামা আছে, অধঃপতনের সময় খসিয়া পড়ে নাই। তিনি আমার কথার উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার নিবাস?'

দিল্লীতে ঘণ্টা কয়েক আগে নিবাস বলিতে গিয়া কি বিপদে পড়িয়াছিলাম! ভাবিলাম, 'কটক' বলা হইবে না। একাএক 'নিবাস ওড়িষ্যা' বলিয়া ফেলিয়া তাহার মুখের দিকে, সত্য কথা বলিতে কি, একটু সগর্বে, তাকাইয়া রহিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, লোকটি 'ভূগোল-বিবরণ' ভুলিয়া গিয়াছে, ওড়িষ্যা যেন আকাশে, নাম কখনও শোনে নাই! এত বড় একটা দেশ, যাহার এক পাশে পাহাড়, আর পাশে সাগর; যাহাতে তিনটা জেলা, আঠারটা রাজ্য আছে, যাহার জনসংখ্যা এক কোটি; বলে কি না 'ওড়িষ্যা কোথায়?' ম্লেচ্ছকে জগন্নাথের দেশ বলা মিছে; কি করি, বলিলাম, 'ভারতবর্ষে।' শুনিয়া সাহেব যেন আবার আকাশ হইতে পড়িলেন! তখন মনে হইল, সাহেব আমাদের দেশকে বলে, 'ইণ্ডিয়া'। অগত্যা তাহাই বলিতে হইল। জানি না, তিনি আমায় কোন্ 'ইণ্ডিয়ান' মনে করিলেন। লোকটি কিন্তু ভদ্র ও বিনয়ী; জিজ্ঞাসিলেন,—

'আপনি বুঝি এদেশে নূতন আসিয়াছেন? দেশটি আমেরিকা।'

কি দুর্ঘটনায় আসিয়া পড়িয়াছি, তিনি জানিতেন না;

'রাজার নাম কি?'

'আমাদের রাজা-টাজা নাই।'

'রাজা নাই, রাজ্য চলে কিসে?'

'আমরা রাজ্য বলি না, বলি এস্‌টেট্‌স্।'

'সে একই কথা।'

সাহেব দ্রুতপদে কোথায় যাইতেছিলেন, আমায় 'শুভ পরাহ্ন' বলিয়া দৌড়াইয়া চলিয়া গেলেন। দেখি, কেবল তিনি নহেন, রাজপথের যাবতীয় নরনারী, এ মুখে সে মুখে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে! আমেরিকার 'রাজ্যযুক্তি'র নাম শুনিয়াছিলাম, একটু শ্রদ্ধাও করিতাম। কিন্তু, লোকগুলা বালক, না উন্মত্ত, বুঝিতে পারিলাম না।

দেখিতে দেখিতে মাথার নীচে দিয়া সূর্য অদৃশ্য হইলেন, অমনি শত শত তাড়িত-দীপ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দূরে দেখি, অট্টালিকার উপরে এক অদ্ভুত কাণ্ড। চাঁদের মতন কি একটা দেখা যাইতেছে। তখন মনে পড়িল, পূর্বকালে এই দেশে দানব বাস করিত, যাহাদের পরাক্রমে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কম্পিত হইতেন। নিকটে মেক্সিকো দেশে ময়-দানবের শিল্প-কীর্তি এখনও 'ময় পুরী' নামে খ্যাত আছে। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ-সভা ময়ের নির্মিত। তাহার স্ফটিক-দর্পণে রাজা দুর্যোধনও বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন। আকাশে যেটা দেখিতেছি, সেটা বা দ্বিতীয় চন্দ্র হইবে। বিজ্ঞানবলে আমেরিকা কি না করিতেছে। এক জনকে সুধাইলাম,—

'মহাশয়, অই যে দূরে রজত-থাল দেখা যাইতেছে, সেটা বুঝি আপনাদেরই গড়া?'

লোকটি আকারে-প্রকারে শিষ্ট বোধ হইয়াছিল। কিন্তু, যে ভাবে আমায় পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, তাহাতে বিরক্ত হইতে লাগিলাম।

'ক্ষমা করুন, আপনি কি বলিতেছিলেন?'

মাথা আর মুণ্ড! কত সতর্ক হইয়া, কেমন ঘুরাইয়া, বিজ্ঞতা করিয়া কথাটা বলিয়াছিলাম! হয় ত দেশের লোকগুলা কালা। রাত-দিন কলের ঘড়্ঘড়ানি শুনিলে আমরাও কালা হইয়া পড়িতাম। সভ্য হওয়া অপেক্ষা সভ্যতার ধাক্কা সামলানো কঠিন। আমাদের দেশে একা শিবু-ঠাকুর পারিয়াছিলেন।

'বলি, ওটা কি দ্বিতীয় চন্দ্র?'

লোকটি আর একবার ক্ষমা চাহিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। বুঝিলাম, সে দেশের লোকের কথা কহিবারও সময় নাই। দিল্লী হইতে এই দেশ মাত্র আট হাজার মাইল। কিন্তু, ব্যবহারে কত ভিন্ন। যে যাহাই বলুক, শিষ্টতায় প্রাচ্যের নিকটে পাশ্চাত্য দাঁড়াইতে পারে না।

কৃত্রিম চাঁদ কি না, দেখিয়াই আসি না। যেমন মনে হওয়া, অমনই হু-হু শব্দে যেন উড়িতে লাগিলাম। প্রথমে মনে হইল যেন 'এরোপেলেন' বিমানে চড়িয়াছি। কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না। একটু পরে বুঝিলাম, মেঘ-স্তর ভেদ করিয়া যাইতেছি। শব্দ আর শুনিতে পাইলাম না। শীতে থর্-থর করিতে লাগিলাম, শ্বাসরোধের উপক্রম হইল! কিন্তু দেখি, কোথায় বা রজতথাল, কোথায় বা চাঁদ! একটা পাহাড়ো দেশে রোদ পড়িয়া দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়াছিল! উচা উচা গিরি, মাঝে মাঝে বিশাল গহ্বর, দীর্ঘ বিবর,—এমন দেশ ত দেখি নাই! আরও আশ্চর্য, জন-মানব নাই, পশু-পক্ষী নাই, তৃণ পর্যন্ত নাই! কিন্তু কি দারুণ রোদ, গা পুড়িয়া যাইতে লাগিল। পাহাড়ের ছায়ায় গেলাম; কি বিপদ! এমন দারুণ শীতও দেখি নাই! দেশের নামটা জানিতে পারিলে সব বুঝিতে পারিতাম। যেমনই মনে হওয়া, অমনই শোনা,—'পথিক তুমি কি খুঁজিতেছ?'

আমি এদিকে সেদিকে তাকাইলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। লোকটি যে-ই হউক, আমার দেহের বর্ণ ও পরিধান নিরীক্ষণ করিতেছে না, ইহাতে স্বস্তি বোধ করিলাম। অদৃশ্য প্রশ্নকারকের উদ্দেশে বলিলাম,

'আমি খুজি নাই কিছু। জিজ্ঞাসি এ দেশের নাম কি?'

'চন্দ্রদেশ।'

'এ দেশের রাজা কে?'

'রাজা নাই, রাণী আছেন।'

'আচ্ছা, তাহাই হউক, রাণীর নাম কি?'

'রাণী বিশ্বেশ্বরী'।

শুনিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। নামটি শোনা শোনা বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু 'চন্দ্রদেশ' মনে করিতে পারিলাম না। পূর্বকালে বঙ্গভূমিতে এক 'চন্দ্রদ্বীপ' ছিল।

'মহাশয়, বলি, চন্দ্রদ্বীপকে কি চন্দ্রদেশ বলিতেছেন ?'

'দ্বীপও বলিতে পারেন, চারিদিকে আকাশ-সমুদ্র। আপনার নিবাস ?' লোকটি বাঙ্গালা বোঝে।

'আমার নিবাস বঙ্গদেশ।'

'বঙ্গদেশ ?'

'কথায় বুঝিতেছি আপনি বাঙ্গালী ; বঙ্গদেশ চেনেন না ? ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তের বঙ্গদেশ।'

'ভারতবর্ষের ?'

লোকটি বোধ হয় বহুকাল বিদেশে প্রবাসী হইয়া দেশের নামটাও ভুলিয়া গিয়াছে।

'জম্বুদ্বীপের ভারতবর্ষ।'

'জম্বুদ্বীপ কোথায় ?'

মনে হইল একবার বলি, জাম গাছের তলায়।

'সাগর-বেষ্টিত জম্বুদ্বীপও চেনেন না ? বলি, পৃথিবীর নাম শুনিয়াছেন ?'

'ওঃ! আপনার নিবাস পৃথিবীতে! এতক্ষণ বলেন নাই কেন ? আপনাকে নমস্কার। আমাদের মাতৃদেশ-নিবাসী!'

আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। জাপানী বঙ্গদেশকে গুরু-দেশ বলে। ইনি কিন্তু পৃথিবীকে মাতৃ-দেশ বলিতেছেন।

'আপনি কি মাতুলালয় চেনেন ?'

'চিনি বই কি। অই যে দেখা যাইতেছে।'

আমি পেছু ফিরিয়া দেখি, চন্দ্র অপেক্ষা চতুর্গুণ বৃহৎ এক রজত-থাল আকাশে দীপ্তি পাইতেছে। তাহাতেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু অল্প। বার আনা অতিশয় উজ্জ্বল, যেন দর্পণে রবিকর প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। দেখিয়া বিস্ময় জন্মিল। ভাবিলাম, এমন দেশে কে না মামাবাড়ী করিতে চাহিবে।

'বলি, কি সূত্রে মাতৃভূমি বলিতেছেন ?'

'যে সূত্রে আপনারা আমাদের দেশকে মাতুলালয় বলেন ?'

'সে ত মুখের কথা ! এই সম্বন্ধ ?'

'আপনারা মুখে বলেন, আমরা কাজে করি। আমরা মাতৃদেশকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করিতেছি।'

'কবে হইতে ?'

'যবে মাতৃ-কুক্ষি হইতে আমাদের দেশের জন্ম হইয়াছে।'

'সে কবে ?'

'জানি না।'

'কেন প্রদক্ষিণ করিতেছেন ?'

'মায়ের আজ্ঞায়।'

মনে মনে ভাবিলাম, লোকটি শিষ্ট, মাতৃভক্ত। আমারও মাতৃভূমি আছে, প্রদক্ষিণ দূরে থাক, চেয়েও দেখি নাই।

কিন্তু দেশটা কিছু নয়। রাণীই বা কেমন, এমন অদ্ভুত প্রজা লইয়া রাজ্য করেন ? এমন সময় দেখি, এক গিরিশৃঙ্গে অপরূপকান্তি অতিসৌম্যা কে বসিয়া আছেন। সুধাইলাম,—

'তুমি একাকী এই মরুদেশে কি করিতেছ ?'

কে যেন উত্তর করিল, 'আমি রাণী, দেশ পালন করিতেছি।'

'তা কর। আমি নির্বাতে ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িয়াছি, শীতেও দাঁড়াইতে পারিতেছি না। কোথায় একটু বাতাস, জল ও আগুন পাই, বলিতে পার ?'

তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দূরে একটা তারা দেখাইয়া দিলেন।

আমি সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। পথ আর ফুরায় না। কিন্তু যত নিকট হইতে লাগিলাম, তারাটি বাড়িতে বাড়িতে পৃথিবীর দশ বার গুণ

বৃহৎ হইয়া পড়িল। উত্তাপ বোধ করিতে লাগিলাম। দেখি, যেমন ভীষণ বাত্যা, তেমনই গগনব্যাপিনী মেঘমালা ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, চন্দ্র দেশের রাণী মেঘে বসিয়া দোল খাইতেছেন!

'তোমাকে চন্দ্রদেশে দেখিয়া আসিলাম। এখানে কখন আসিলে? কে যেন বলিল, 'আমি চিরকাল এখানে আছি।'

কথাটা বড় বিশ্বাস হইল না। হয় ত বাদিয়ার মেয়ে, কুহক জানে। যে মেয়ে নির্বাত নির্জল নির্জীব দেশের গিরিশৃঙ্গ আসন করিতে পারে,সে ঝঞ্ঝা ও মেঘে দোল-খেলা করিবে,আশ্চর্য কি? যাহা হউক, আমার শীত গিয়াছে। প্রচুর বাষ্পে তৃষ্ণা গিয়াছে, ভীষণ পবনে শ্বাস-প্রশ্বাসেরও কষ্ট নাই। এক স্থানে দেখি, বিশাল অগ্নি রক্তবর্ণ হইয়া জ্বলিতেছে। অগ্নিকুণ্ডটি কত যোজন কে জানে। আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছি, শুনিলাম, 'পথিক, তুমি কি চাও?'

'আমি চাই না কিছু। বলি, অই আগুনটা কেন?'

'যজ্ঞের অগ্নি।'

'কে যজ্ঞ করেন?'

'বৃহস্পতি।'

'বৃহস্পতি ত সুর-গুরু। আপনাদের দেশের নাম কি?'

'বৃহস্পতি।'

'আমাদের ঋষির নামে বুঝি আপনারা দেশের নাম রাখিয়াছেন? তা, নামটি মন্দ হয় নাই, দেশটি বৃহৎ বটে, দেশের তেজও বৃহৎ বটে।'

'তোমার নিবাস?'

'আমার নিবাস পৃথিবী।'

'পৃথিবী?'

'আজ্ঞে হাঁ। পৃথিবী বুঝি চেনেন না? যে পৃথিবীকে চন্দ্র ভক্তিভরে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করিতেছে।'

'কয়টি চন্দ্র বলিলে ?'

'কয়টি কি ? একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি।' বলিয়া মনে হইল, চন্দ্রটি একবার দেখাইয়া দিই। কিন্তু পেছু ফিরিয়া দেখি, চন্দ্র-টন্দ্র কিছুই নাই!

'চিন্তিত কেন ?'

'চিন্তিত নই, বলি আপনাদের চন্দ্র আছে ?'

'হাঁ, গোটা নয়েক আছে।'

দেখিলাম, সত্যই ত। চারিটা বড়। ভাগ্যে আমাদের নয়টা নাই! থাকিলে গ্রহণগণনায় আমাদের পাঁজি ভরিয়া যাইত, যাত্রিক দিন পাওয়া যাইত না।

'মহাশয়, আপনি গুরু বৃহস্পতির দেশে থাকেন, অথচ সপ্ত-সাগরা সপ্ত-দ্বীপা পৃথিবীর নাম শোনেন নাই ?'

'বোধ হয়, অইটা ?'

এই বলিয়া অতি ক্ষুদ্র, প্রায় অদৃশ্য, একটা তারা দেখাইলেন। দেখিয়া আমার গর্ব গেল, অভিমানে কান্না পাইতে লাগিল। তথাপি,

'বলি, আপনাদের দেশটি স্থির ত ? না চন্দ্রের মতন ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রাণান্ত ?'

অদৃশ্য পুরুষ সঙ্কেত করিলেন, আমায় কে যেন একটা তারার দিকে টানিয়া লইতে লাগিল। দেখি, তারা নয়, আমাদের সূর্যের মত কি এক প্রদীপ্ত থালা; থালা নয়, জ্যোতির্ময় এক বিশাল চক্র; চক্র নয়, অগ্নিময় এক বিপুল পিণ্ড। তাহার কিরণচ্ছটা গগন ভেদ করিয়াছে, লোহিত লোল জিহ্বা দিগ্‌দিগন্তে লক্-লক্ করিতেছে, জ্বালাময় বাষ্প প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। কিন্তু, এ কি ? তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, বিদ্যুৎপ্রভা, মহিমময়ী সেই নারী হরিপৃষ্ঠে স্বচ্ছন্দে বসিয়া আছেন! তাঁহার পাদাঙ্গুষ্ঠে দীর্ঘ রশ্মি, রশ্মির প্রান্তে কতকগুলা পিণ্ড বদ্ধ রহিয়াছে, এবং তিনি, বালিকার ন্যায়,

সূত্রবদ্ধ লোষ্ট্র-ঘূর্ণনের ন্যায়, সেই বিপুল পিণ্ডগুলা অঙ্গুষ্ঠসঞ্চালন দ্বারা ঘুরাইতেছেন। আমি খেলা দেখিতেছি, কে যেন বলিল, 'পান্থ, তুমি কি দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছ ?'

'দিগ্‌ভ্রান্ত ! আমি যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। বলিতে পারেন, আপনাদের দেশের নাম কি ?'

'সূর্য-দেশ।'

'উনি, বুঝি, আপনাদের দেশের রাণী ?'

'হাঁ, রাণী বিশ্বেশ্বরী ! প্রণাম কর।'

কি জানি কেন, সাবিত্রী স্মরণ হইল।

'বলি, পিণ্ডগুলা কি আপনাদেরই দেশের মাটি ?'

'তা বই আর কি।'

মনে পড়িল, আমরা যে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, 'ক্ষুদ্রক', বৃহস্পতি, শনি, ইয়ুরেন, নেপচুন নামে নয়টা গ্রহ গণি, সেগুলাই রশিতে বাঁধা হইয়া সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এক রশিতে নয়, সব রশি সমান লম্বাও নয়। 'ক্ষুদ্রক' একটা পিণ্ড নয়, অগণ্য ; শউল মাছের ঝাঁকের মতন পাশে পাশে থাকিয়া ছুটিতেছে। হায়, পৃথ্বী, তোমায় পৃথুলা বলিয়া জানিতাম ! তাহার দশা দেখিয়া, কি জানি কেন, দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইল। এই মাটিটুকুর তরে, তাও সবটুকু নয় ; একটু, অতি একটু'র তরে, এত মারা-মারি হানা-হানি হইয়া গেল !

আশে পাশে দেখি, পুঞ্জে পুঞ্জে উল্কা উঠিতেছে, পড়িতেছে ; কোনটা ভীষণনিনাদে বিদীর্ণ হইতেছে। কোনটা ছিন্ন-ভিন্ন, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধুলির আকারে আকাশ ব্যাপ্ত করিয়াছে। পুঞ্জে পুঞ্জে ধূমকেতু পুচ্ছ বিস্তার করিয়া ভয়ঙ্করবেগে ধাবিত হইতেছে। আমার চোখ বুজিয়া আসিল, মনে হইতে লাগিল, সে দেশ ছাড়িয়া চলিয়াছি ; কত পথ চলিয়াছি, পথের তবু শেষ

নাই। পরে তাপ অনুভব করিলাম, চোখ মেলিয়া দেখি, আর এক বিশাল সূর্যের সম্মুখীন হইয়াছি। এ আবার কি ?

'হে বিদেশী, তুমি কোথায় চলিয়াছ ?'

শব্দ শুনিয়া, বিশেষতঃ 'বিদেশী' ডাকে চৈতন্য হইল।

'তা ত জানি না। বোধ হয় দেশ-পর্যটনে। বলি, আপনাদের দেশের নাম কি ?'

'কিন্নরী দেশ। তোমার নিবাস ?'

'পর্যটকের নিবাস আর কি ? সম্প্রতি সূর্যদেশ হইতে আসিতেছি।'

'কোন্ সূর্য-দেশ ?'

লোকটি বলে কি ? বলে, কোন্ সূর্য-দেশ !

'জবা-সঙ্কাশ সহস্রাংশু দিবাকর সূর্য। বুঝিয়াছেন ?'

'কই, এ নাম ত শুনি নাই। কোথায় ?'

'না শোনা আশ্চর্য নয়। এদেশে বিদ্যালয় আছে কি, 'ভূগোল-বিবরণ' পড়া হয় কি ? হইলে জানিতেন, জগতে সূর্য এক, দ্বিতীয় নাস্তি। আমরা একটা তারার নাম 'কিন্নরী' রাখিয়াছি। আপনারা, বুঝি, সে নামটা লইয়াছেন ? তা, রাণীর নাম কি ?'

'রাণী বিশ্বেশ্বরী।'

'বিশ্বেশ্বরী ? বলেন কি, তাঁর রাজ্য হইতেই ত আসিতেছি !'

এই কথা বলিতে না বলিতে দেখি, সেই দূর, অতিদূর দেশে, সূর্যদেশের সেই নিরুপমা সস্নেহে সর্বদিক নিরীক্ষণ করিতেছেন। সাহসে আমার বুক ভরিয়া গেল ; আশ্বাসে বলিলাম, 'মা, তুমি এখানে, অথচ আমায় বলে বিদেশী ?'

এখন আর ভয় নাই, স্বচ্ছন্দে এ তারা, সে তারা দেখিতে লাগিলাম ; নীল, শুক্ল, পীত, লোহিত, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, অতি বৃহৎ। কোটী কোটী প্রদীপ্ত

কোটী কোটী তমোবৃত। পৃথিবী হইতে এ সব দেখিতে পাইতাম না, অন্ধকার দেখার বিষয় নয়। কিন্তু, কে এ বামা? একটা তারা লইয়া আর একটার দিকে ভীমবেগে নিক্ষেপ করিতেছে, দুইটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া আকাশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করিতেছে! কে এ চণ্ডী, দুইটা তারা ঠুকিয়া দিতেছে, দুইটা মিলিয়া একটা হইয়া যাইতেছে, দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে, পরে নিবিয়া যাইতেছে। যে দিকে তাকাই, সে দিকেই সেই রণ-রঙ্গিণী। কখনও নীরদবর্ণা শ্যামা, কখনও হসিতবদনা, কখনও ভীমা। ত্রাসে কাঁপিতে লাগিলাম, বুক ধড়াস্‌-ধড়াস্‌ করিতে লাগিল। ভয়ে পলাইয়া গেলাম। দেখি, গৃহিণী যেমন যষ্টি দ্বারা দুগ্ধ আবর্তন করেন, এক বর্ষীয়সী দিগন্তব্যাপী 'নভস্ত' আবর্তিত করিতেছেন। শ্বেত ফেনপুঞ্জ বলয়াকারে ভ্রমণ করিতেছে, অধোগত ঊর্ধ্বগত হইতেছে, আকুঞ্চিত প্রসারিত হইতেছে। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলাম, 'এ কি মা, কি করিতেছ?'

'সং-হা-র দ্বারা নূতন জগৎ গড়িতেছি।'

আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, মূর্ছিত হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ পরে, মনে নাই, দেখি এক বিস্তীর্ণ সাগরে পাথরের এক দ্বীপ ভাসিতেছে। দ্বীপের দুই পাশের দুই বাহু ছিন্ন হইল, দ্বীপ ত্রিকোণ হইল। উত্তরদিকে মুহুর্মুহুঃ ভীষণ নাদ ও প্রচণ্ড ভূ-কম্প হইতে লাগিল, সাগর ভেদ করিয়া এক উচ্চ পর্বতমালা উত্থিত হইল। মনে হইল যেন চিনি, যেন দেখিয়াছি। কত কাল গেল, কত বৃষ্টি-বাত্যা বহিল, কত পাথর ক্ষয় পাইল, কত নদী বহিল। দেখি, এক ধাত্রী অণু নিরীক্ষণ করিতেছেন, যেখানে যেটি মানায়, সেখানে সেটি সাজাইয়া সাজাইয়া তৃণ-লতা, পশু-পক্ষী, মানুষও গড়িলেন। নিকটে এক বালিকা অণুকে কন্দুক করিয়া উৎক্ষেপ করিতেছে, লুফিয়া ধরিতেছে। এক নয়, দুই নয়, শত নয়, কোটী নয়। আহা কি কান্তি, কি মুক্তাফলের লাবণ্য সর্বাঙ্গে মূর্ছিত হইতেছে। কি প্রসন্না, কি মুগ্ধা, কি অভিরামা! মনে হইতে

লাগিল, কত কালের চেনা জানা হাতে মানুষ-করা আমার বিজয়া-কন্যা ক্রীড়া করিতেছে।

'মা, তোমায় এত খেলা আসে? মহতের খেলাতেও সাধ মিটিল না, অণুর কন্দুক লইয়া খেলা?'

মায়ের মুখমণ্ডলে স্মিতরেখা দেখিতে পাইলাম। ধন-ধান্যে, যোগ-ক্ষেমে ভারত ভরিয়া উঠিল। পুরাতন ঋষির স্তব শুনিতে পাইলাম,—

হে বিশ্বেশ্বরি, তুমি বিশ্বাত্মিকা, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারিণী। তুমিই জগৎ ধারণ করিতেছ, পালন করিতেছ। তুমিই জগৎ-প্রতিষ্ঠা; অতিসৌম্যা, অতি-রুদ্রা। তুমিই অখিল জগতের মা, তুমিই ধাত্রী, তুমিই শক্তি। প্রসন্ন হও।'

কে যেন বলিল, 'মা ভৈঃ। আমি মা, এত কাছে আছি, দেখিতে পাইতেছ না?'

দেশে বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠা

বিদ্যা ও বিজ্ঞান, কলা ও বার্তা

সাহিত্য-সম্মিলনে আলোচ্য বিষয় চারি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখা, বিজ্ঞান। আমরা দেশের বিজ্ঞান-বিষয়ে আলোচনা করিতে সমবেত হইয়াছি।

আলোচনার পূর্বে বিষয়টা একটু বুঝিয়া লইলে ভাল হয়। বিদ্যা কি, তাহা আমরা বুঝি। বিদ্যা যা, জ্ঞানও তা। কিন্তু প্রয়োগে আমরা বিদ্যা ও জ্ঞানের একটু প্রভেদ করিয়া থাকি। শিশুর জ্ঞান অল্প, বৃদ্ধের অধিক। বৃদ্ধ জ্ঞানী হইতে পারেন, বিদ্যাবান্ না হইতে পারেন। তেমনই, বালক বিদ্যাবান্ হইলেও জ্ঞানী না হইতে পারে। বস্তুতঃ, অধ্যয়নাদিজনিত জ্ঞান, বিদ্যা, এবং জ্ঞানের নিমিত্ত যাহা অধ্যয়নযোগ্য তাহাও বিদ্যা। সংসারধর্ম আচরণ করিতে যাহা কিছু জানা আবশ্যক, সবই বিদ্যার বিষয়। প্রাচীনেরা অষ্টাদশ শাখায় বিদ্যা বিভাগ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বিদ্যার এত ভাগ না করিয়া অল্প করিয়াছিলেন। নীতিকার শুক্রাচার্য রাজাকে চারি বিদ্যা সর্বদা অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন। সে চারি বিদ্যা এই,—(১) আন্বীক্ষিকী,—স্থূলতঃ তর্ক-বিদ্যা, (২) ত্রয়ী,—অঙ্গ-উপাঙ্গ-সহ তিন বেদ, (৩) বার্তা,—যাহা বৃত্তি করিয়া প্রজার সংসার-যাত্রা নির্বাহ হইয়া থাকে, (৪) দণ্ডনীতি,—রাজ্যশাসননীতি। যাবতীয় বিদ্যা এই চারি ভাগের অন্তর্গত হইয়াছে।

সাহিত্য-সম্মেলন বিদ্যার্থীর সম্মেলন। এখানেও বিদ্যা চারি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান,—এই চারি শাখা। বিদ্যা-বৃক্ষের এই চারি শাখা কল্পনা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না, সম্প্রতি সে বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞান কি, তাহা বুঝা যাউক। কেহ কেহ

বলিয়াছেন, কোন বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান, বি-জ্ঞান ; কিংবা যাবতীয় বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান, বিজ্ঞান। এই অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। একটু সঙ্কোচ করিয়া মোক্ষ-বিষয়ক জ্ঞান, বিজ্ঞানের বহির্ভূত করা হইয়াছে। অমরকোষের মতে, শিল্প ও শাস্ত্রের যে জ্ঞান, তাহা বিজ্ঞান। চিত্রাদি শিল্প, ব্যাকরণাদি শাস্ত্র। এই অর্থও বিস্তৃত হইল। আর একটু সঙ্কোচ করা যাউক। অমরকোষের এক টীকাকার বলেন, বিরূপং জ্ঞানং বিজ্ঞানং। বিভিন্ন রূপের যে জ্ঞান, তাহা বিজ্ঞান। চিত্রশিল্পে মূর্তির, ব্যাকরণ-শাস্ত্রে শব্দের নানা রূপ প্রদর্শিত হয়। এই কারণে শিল্প ও ব্যাকরণ বিজ্ঞান। কিন্তু এই অর্থ আমাদের আলোচ্য বিজ্ঞানের নহে। নানা রূপে প্রকৃতি কার্য করিতেছেন ; প্রকৃতির এই যে অসংখ্য রূপ, রূপ-পরিবর্তন-প্রবৃত্তি, তাহার জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। ক্ষিতি-অপ্-তেজাদি পঞ্চভূত আমাদের পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। এই পঞ্চভূতের জ্ঞান বিজ্ঞান, ভৌতিক বিজ্ঞান। প্রকৃতি বহুভেদ-বিশিষ্ট, বিচিত্র। ইহার উপাদান জড় কল্পিত হইয়াছে ; শক্তি জড়কে স্পন্দিত করিতেছে। এই জড়শক্তিময়ীর জ্ঞান বিজ্ঞান, জড়-বিজ্ঞান। আমরা যে ভাবেই দেখি, সেই একেরই জ্ঞান ; এই হেতু বিজ্ঞান সংজ্ঞা দ্বারা প্রাকৃতিক, ভৌতিক বা জড়বিজ্ঞান বুঝি।

কখন-কখন গ্রাম্যজন কলেজের বিজ্ঞানশালায় আসিয়া সজ্জা ও উপকরণাদি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে, এখানে আপনারা কি করিতেছেন ? বলিতে হয়, খেলা করিতেছি ; পণ্ডিত দেখিলে বলিতে হয়, প্রকৃতির সহিত খেলা করিতেছি। এই উত্তরে পণ্ডিত দর্শক সন্তুষ্ট হন না। কিন্তু বুঝাইবারও উপায় নাই। পঠন, পাঠন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ইহাই ত বিদ্যালয়ে হইয়া থাকে। পঠন-পাঠনাদি বিদ্যালয়ের কাজ বটে ; কেন না বাগ্‌দেবী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী। শুক্রাচার্যও বলিয়াছেন, "যদ্যৎস্যাৎ বাচিকং সম্যক্ কর্ম বিদ্যাভিসংজ্ঞিতম্"—যাহা যাহা সম্যক্ বাচিক কর্ম তাহা বিদ্যা। বিদ্যালয়,

পাঠশালা। সেখানে মনন ব্যতীত বাগিন্দ্রিয় প্রধান। বিজ্ঞানশালায় মনন ব্যতীত চক্ষু-কর্ণ-নাসিকাদি পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রধান। সেখানে এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞানার্জন হইয়া থাকে।

কিন্তু দর্শক এই উত্তরেও সন্তুষ্ট হন না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ফল কি?

কিন্তু বিদ্যার ফল কি? বিদ্যায়াশ্চ ফলং জ্ঞানং, আর বিদ্যা দদাতি বিনয়ং। বিদ্যার ফল জ্ঞান আর বিনয়; বিজ্ঞানেরও ফল তাই। বোধ হয় বিজ্ঞানের দ্বারা বিনয় অধিক লাভ হয়। কারণ জ্ঞানের মূলে জ্ঞানেন্দ্রিয়, যাহার সাহায্যে আমরা সৎ-অসৎ সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা ও বিবেক করিয়া থাকি। প্রকৃতির নিকট প্রতারণার ঠাঁই নাই। জ্ঞান ও বিনয়, এই দুই কাম্য করিয়া বলা যায়, বিদ্যার্থে বিদ্যা অভ্যাস কর, বিজ্ঞানার্থে বিজ্ঞান অভ্যাস কর। দুই-ই ফলে এক।

কিন্তু জ্ঞান ও বিনয় এই দুয়ের প্রয়োজন কি? চরকে ভগবান আত্রেয় বলিয়াছেন, মানবের তিন এষণা,—অন্বেষণ, ইচ্ছা আছে। প্রথম প্রাণৈষণা, প্রাণরক্ষার ইচ্ছা; কারণ প্রাণত্যাগে সর্বত্যাগ। প্রাণৈষণার পর ধনৈষণা, ধন-প্রাপ্তির ইচ্ছা। কারণ ধন না থাকিলে পাপী হইতে হয়, আয়ু দীর্ঘ হয় না। অনন্তর পরলোকৈষণা, পরলোকে সদ্গতির চিন্তা। এই তিন এষণার পক্ষে জ্ঞান ও বিনয় সহায়। প্রাণৈষণা হইতে আয়ুর্বিদ্যার, ধনৈষণা হইতে বার্তা ও কলার, এবং পরলোকৈষণা হইতে দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। বিজ্ঞান দ্বারা প্রথম দুই এষণার কতদূর সিদ্ধি হইয়াছে তাহা পৌরজনের নিকট অবিদিত নাই। নীতিকার শুক্রাচার্যও বলিয়াছেন, "সংসৃতৌ ব্যবহারায় সারভূতং ধনং স্মৃতম্"—সংসারে ব্যবহারের নিমিত্ত ধনই সার। ধন নইলে প্রাণরক্ষা হয় না—ইহা ত প্রত্যক্ষ হইতেছে।

কিন্তু কিসে ধন আসিতে পারে? "সুবিদ্যয়াসু সেবাভিঃ শৌর্যেণ

কৃষিভিস্তথা। কৌসীদবৃদ্ধ্যাপণ্যেন কলাভিশ্চ প্রতিগ্রহৈঃ। যয়া কয়াচাপি বৃত্ত্যা ধনবান্ স্যাৎ তথাচরেৎ॥" উত্তমবিদ্যা ; উত্তমসেবা যেমন রাজসেবা ; শৌর্য যেমন সৈনিকের ; কৃষি ; কুসীদবৃত্তি যেমন মহাজনি, বেঙ্কিং ; বাণিজ্য ; কলা ; ও প্রতিগ্রহ (দান প্রাপ্তি ও গ্রহণ) ; ইত্যাদি বৃত্তি এমন আচরণ করিবে যাহাতে ধনবান্ হইতে পারিবে। ইহা আমাদের দেশের নীতি, সর্বদেশের সর্বকালের নীতি। জ্ঞান ও বিনয় থাকিলে এই সকল বৃত্তি সম্যক্ আচরিত হয়।

কিন্তু, কলা কাহাকে বলে ? সংস্কৃত কলনা শব্দে বশীভূতত্ব, বশতা বুঝায়। ইহা হইতে "অনেকরূপাবির্ভাবকৃতিজ্ঞানং কলা স্মৃতা।" এক পদার্থের নানা আকারে আবির্ভাব করিবার জ্ঞানের নাম কলা। রূপ দিবার, গড়িবার নাম কলা। একারণ শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, "শক্তো মূকোঽপি যৎকর্তুং কলাসংজ্ঞং তু তৎ স্মৃতম্"—যাহা মূক ব্যক্তিও করিতে পারে তাহা কলা। মূক বিদ্যাবান্ হইতে পারে না। বিদ্যা বাচিক কর্ম, কলা হাস্ত কর্ম। কারু হাস্ত-কর্ম করে, এবং যে কারু কলাভিজ্ঞ ও কলাসংস্কর্তা তিনি শিল্পী। "সংস্কর্তা তৎকলাভিজ্ঞঃ শিল্পী প্রোক্তো মনীষিভিঃ" (শুক্র)। প্রকৃতিদত্ত পদার্থে বুদ্ধিপ্রয়োগ করিয়া হস্তদ্বারা সিদ্ধির নাম কলা। আকর হইতে লৌহবহিষ্করণ লৌহকলা, বালুকা ও ক্ষারযোগে কাচকরণ কাচকলা, এবং পুষ্পমালারচনা মাল্যকলা, গীতবাদ্যাদি সঙ্গীতকলা ইত্যাদি। কোন কলা লৌকিক উপযোগের নিমিত্ত, কোন কলা আনন্দের নিমিত্ত। কারুকলা ও কান্তকলা বলি, ভাগ যাহাই করি, "বিদ্যাহ্যনন্তাশ্চ কলাঃ সংখ্যাতুং নৈব শক্যতে"—বিদ্যা ও কলা অনন্ত, সংখ্যা করিতে পারা যায় না।

কিন্তু, বিদ্যা ও কলা অভ্যাস ব্যতীত জীবিকার অপর উপায় আছে। তন্মধ্যে বৈশ্য অর্থাৎ প্রজাবর্গের যে বৃত্তি, তাহা বার্তা। "কুসীদকৃষিবাণিজ্যং গোরক্ষা বার্তয়োচ্যতে।"—কুসীদ (প্রয়োগদ্বারা ধন বৃদ্ধি), কৃষি, বাণিজ্য ও

পশুপালন, এই চারি বার্তা নামে কথিত হয়। কৃষি ও পশুপালনের নিমিত্ত মানুষ আয়োজন করে, কিন্তু ফল প্রকৃতিদত্ত। আয়ুর্বেদ বিদ্যাবিশেষ; কিন্তু চিকিৎসাবৃত্তি বিদ্যা নহে, কলা নহে, বার্তাবিশেষ। তেমনই কুসীদবৃত্তিও বিদ্যা নহে, কলা নহে। বাণিজ্য-বৃত্তি ত্রিবিধ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়। (১) স্বচ্ছন্দলব্ধ দ্রব্যের, যেমন মণি মুক্তার ও কাষ্ঠ ও আরণ্য বৃক্ষফলাদির; (২) কৃষি ও পশুপালন দ্বারা লব্ধ দ্রব্যের, যেমন ধান-গমের, ঘি-দুধের; (৩) কলাজাত দ্রব্যের। বাণিজ্য ব্যতীত সমাজ টিকিতে পারে না, এবং কলা ও বার্তার নিমিত্ত বার্ধুকির প্রয়োজন।

বার্তা ও কলা হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি। বার্তা ও কলায় বিজ্ঞানের স্থিতি। জীবনধারণপ্রবৃত্তি, বার্তা ও কলার জননী। বার্তা ও কলার অনুষ্ঠানে প্রকৃতির রহস্য উদ্ভেদ আরম্ভ হইয়াছিল। একথাও স্বীকার্য,—জ্ঞানান্বেষণা, জ্ঞানৈষণা মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই এষণার মূলে কিন্তু জীবনসংগ্রাম বিদ্যমান। প্রকৃতি স্বেচ্ছাপূর্বক কিছুই দেন না; সব বুদ্ধিবলে কাড়িয়া লইতে হয়। আমি আহার বিনা পড়িয়া থাকি, প্রকৃতি বলেন কর কি! কিন্তু এই পর্যন্ত। তারপর আমাকে দেখিয়া শুনিয়া শিখিয়া খুজিয়া লইতে হইবে। কোথায় কোন্ দেশে কোন্ গাছে সুমিষ্ট ফল পাকিয়াছে, তাহা আমাকে খুজিয়া লইতে হইবে। তেমন ফল আমার দেশে আমার গ্রামে বাড়ীর কাছে ফলাইতে পারি কি না, এই এষণা আসিবে। এইরূপ এষণা হইতে বিজ্ঞানের জন্ম। কৃষক উত্তম শস্য অন্বেষণ করে; অধিক শস্য আকাঙ্ক্ষা করে; কিন্তু পায় না। দেখে, কোথায় উত্তম শস্য অধিক জন্মিয়াছে। কেন জন্মিয়াছে, তাহার কারণ অন্বেষণ করে। কারণ ঠিক কি না পরীক্ষা করিয়া দেখে। হয়ত কারণ অসিদ্ধ হয়, হয়ত সিদ্ধ হয়। অসিদ্ধি ও সিদ্ধি, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি চলিতে থাকে। বিজ্ঞানেও তাই। বিজ্ঞানের অনুসন্ধানমার্গ পুরাতন। চরকে

পার্থিব, ঔদ্ভিদ, জাঙ্গম, এই ত্রিবিধ দ্রব্য কথিত হইয়াছে। ইহাদের জাতি-গুণ-ক্রিয়া অনুসন্ধানে জ্ঞানের উৎপত্তি। জ্ঞানের পরীক্ষা চতুর্বিধ,—প্রত্যক্ষ, অনুমান, যুক্তি ও আপ্তোপদেশ। আত্মা মন ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বিষয় অর্থাৎ পঞ্চভূত, ইহাদের যোগে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। অনুমান ত্রিবিধ; ধূম হইতে বহ্নির অনুমান—কার্যলিঙ্গানুমান; বৃক্ষ হইতে বীজের অনুমান—কারণলিঙ্গানুমান; বীজদর্শনে তৎকারণভূত ফলের প্রত্যক্ষ দ্বারা তৎকার্য ভাবী ফলের অনুমান—কার্যকারণলিঙ্গানুমান। লিঙ্গ অর্থে হেতু। যে বুদ্ধি বহু-কারণ-যোগজাত ফল দর্শন করিতে সমর্থ হয় তাহার নাম যুক্তি, অর্থাৎ অনেক কারণের যোগে ফল বলিয়া যুক্তি। জল কৃষি বীজ ও ঋতুর যোগে শস্য হয়। ইহা যুক্তি। যাঁহারা জ্ঞানী ও শিষ্ট, যাঁহাদের জ্ঞান নির্মল ও সর্বদা অব্যাহত, তাঁহারা আপ্ত। আপ্তের বাক্যে সংশয় নাই, তিনি সত্য কহেন। আমরা আপ্তোপদেশ ব্যতীত এক দণ্ড চলিতে পারি না। কণাদ অণু-পরমাণু গণিয়াছেন, কণাদ আপ্ত; নিউটন মাধ্যাকর্ষণে পৃথিবীকে ঘুরাইয়াছিলেন; নিউটন আপ্ত। অণু-পরমাণু গণিবার, মাধ্যাকর্ষণ প্রমাণ করিবার বুদ্ধি আমার নাই। সে বুদ্ধি আমার থাকিলে কণাদ ও নিউটনকে আপ্ত বলিতাম না। আপ্তোপদেশ মানিলেও চিন্তা যে স্বাধীন হইতে পারে, তাহা আমাদের দর্শনে ও ধর্মবিশ্বাসে সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

কার্যকারণ-অনুসন্ধানের পূর্বে ভূয়োদর্শন আবশ্যক। বহুবার দর্শন এবং দর্শন হইতে অনুমান করিলে ভূয়োদর্শন বলা যায়। জল বিনা বীজের অঙ্কুর হয় না; ইহা কৃষক জানে, ভূয়োদর্শনে জানে। কিন্তু কৃষকের দৃষ্টি এটা ওটা সেটার প্রতি, যে যে বীজের অঙ্কুরোদ্গম সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি এটা ওটা নহে, এ বীজ সে বীজ নহে; তিনি দেখিলেন যাবতীয় বীজ, বীজ-নামায়, বীজবর্গ, জল না পাইলে অঙ্কুরিত হয় না। কৃষকের জ্ঞান অস্পষ্ট, তাহার চিন্তাপদ্ধতি বক্র, তাহার ভূয়োদর্শন গৌণ।

বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান স্পষ্ট, তাঁহার পদ্ধতি ঋজু, তাঁহার ভূয়োদর্শন মুখ্য। ভূয়োদর্শন হইতে বর্গীকরণ বা আরোহ, তাঁহার উদ্দেশ্য। যে বিজ্ঞানে বর্গীকরণ যত, সে বিজ্ঞান তত উন্নত বলা যায়। দ্রব্যের বড় বড় তালিকা, গুণের বিশদ বর্ণনা, কিংবা ক্রিয়ার পূর্বাপরত্বসূচনা বিজ্ঞান নহে। কিন্তু একটা মুখ্য উদ্দেশ্য, একটা সূত্র ধরিয়া দ্রব্য গুণ ও ক্রিয়া বর্ণিত হইলে বিজ্ঞান হইতে পারিবে। নদীর বালি গণিয়া মাপিয়া জুখিয়া আকৃতি বর্ণ প্রভৃতি লিখিয়া এক বিপুল গ্রন্থ পূর্ণ করিলেই বালুকা-বিজ্ঞান হইবে না। নানারূপতার মধ্যে একরূপতার সাধন চাই। নানারূপ এক নির্দিষ্ট সূত্রে গাঁথা চাই। ভূয়োদর্শন উদ্দেশ্যানুসারে বিন্যস্ত হইলে বিজ্ঞান হয়, নতুবা দেখামাত্র সার। এ কারণে বলা যায়, সুবিন্যস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান।

কিন্তু জ্ঞানের অভাবে, উপাদানের অভাবে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। সাংখ্যকার বলিয়াছেন, অতিদূরত্ব হেতু, অতিসামীপ্য হেতু, সূক্ষ্মত্ব হেতু, অন্য বস্তুর ব্যবধান হেতু, অন্য পদার্থের দ্বারা অভিভব হেতু, সমান বস্তুর সহিত মিশ্র হেতু, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাধা হইয়া থাকে। তখন সূত্রের বিন্যাসে সংশয় আসে। সংশয় ও বিতর্কে সূত্র কল্পিত হয়, উহ আশ্রয় করিতে হয়। নূতন-লব্ধ জ্ঞান পুরাতন সূত্রের ও উহের অন্তর্গত না হইলে উহ পরিবর্তন করিতে হয়। অতএব মনে রাখিতে হইবে, উহ বিজ্ঞান নহে, উহী আপ্ত নহেন। সংশয় চিরদিন থাকিবে এবং সংশয়-মোচনের প্রয়াস—গবেষণাও চিরদিন থাকিবে।

কিন্তু এত যত্ন এত গবেষণা কাহার নিমিত্ত? প্রকৃতি কার্য-কারণের হেতু; পুরুষ সুখ-দুঃখের হেতু।* সেই পুরুষের—সেই আমির নিমিত্ত, আমার বর্তন নিমিত্ত বিজ্ঞান। আমাকে ছাড়িয়া বিজ্ঞান নহে। আমার সৌখ্যচিন্তা বিজ্ঞানের কর্তব্য না হইলে বিজ্ঞানে কি ফল? আজিকার-কালিকার আমি নহে, এ গ্রামের সে গ্রামের, স্বদেশের বিদেশের আমির সৌখ্য নহে, মানবের

সৌখ্য বিজ্ঞানের চিন্তা। ইহার দেশ বিস্তীর্ণ, কাল বিস্তীর্ণ, পাত্র বিস্তীর্ণ। এই হেতু বিজ্ঞানের সমাদর, পূজা, বিজ্ঞানের মহত্ত্ব।

দেশে বিজ্ঞানের স্থিতি।

বিজ্ঞান-সেবীর সভায় বিজ্ঞানের গুণকীর্তন অনাবশ্যক। এখানে অনেক বিজ্ঞান-অধ্যাপক উপস্থিত আছেন; তাঁহাদিগকে আমি একটা প্রশ্ন করিতেছি। তাঁহারা বিজ্ঞানের সার্থকতা দেখিতেছেন কি? কয়জন ছাত্র পাইয়াছেন, যাহারা বিজ্ঞানের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, যাহাদের চরিত্রে বিজ্ঞানের বিনয় ও জ্ঞানের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছে, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিসংগ্রহ মুখ্য উদ্দেশ্য না করিয়া বিজ্ঞানশালায় প্রবিষ্ট হইয়াছে? আমার জানায় শত জনের পাঁচজনও হয় কিনা, সন্দেহ। কিছুকাল বিজ্ঞানশালায় কাটাইলে বৈজ্ঞানিক মার্গে চলিলে বিনয় অবশ্য অভ্যাস হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার যোগ্য জ্ঞানও অবশ্য হয়। কিন্তু, ইহাই কি পরম লাভ বলিতে হইবে?

কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার দ্বারা বিজ্ঞান-অভ্যাসের সফলতা দেখিতে অভিলাষী। এই যথার্থ অভিলাষ পূর্ণ হইতেছে না কেন? ছাত্রের দোষে? আমাদের ছাত্রেরা জড়বুদ্ধি, অধ্যবসায়হীন? বিলাতের অধ্যাপকেরা কিন্তু, আমাদের ছাত্রদিগের মেধা দেখিয়া চমৎকৃত হন। কেহ কেহ বলেন, আমাদের, অধ্যাপকবর্গের, অসিদ্ধিহেতু ছাত্রগণেরও অসিদ্ধি। যাঁহারা স্বয়ং অসিদ্ধ, তাঁহারা অপরকে সিদ্ধ করিতে পারেন না। কথাটা অমূলক বলিতে পারি না। ইহাও স্মরণ করিতে হইবে, অধ্যাপকবর্গের অসিদ্ধিরও কারণ আছে। অধিকাংশ সময় তাঁহাদিগের দৈনন্দিন অধ্যাপনায় কাটে। ইহার পর ক্লান্তি আসে, শরীর মন বয় না। যাঁহারা এই গুরুকর্মের পর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে রত হইতে পারেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অসাধারণ। হয়ত তাঁহারা লোহার দেহ পাইয়াছেন, কিংবা দেহটা ক্ষণভঙ্গুর করিয়াছেন।

এখানে মধ্যমের কথা, সাধারণের কথা আলোচ্য। চারিপাঁচ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত কলেজের অধ্যাপকের নিজের বলিতে একটু সময় থাকিত না ; এমন ঘটনাও জানা আছে অধ্যাপকের গবেষণার প্রতিকূলতা করা হইত। কলেজের বাহিরের লোকে এ সব সংবাদ রাখেন না, অধ্যাপনার ঘণ্টা গণিয়া অধ্যাপকের শ্রমের পরিমাণ করেন। তাঁহারা জানেন না, বিজ্ঞানশালায় ছাত্রদিগের সহিত দুই ঘণ্টা পরিশ্রমে কি ক্লান্তি ও অবসাদ আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশযোগ্য হইলেই সকল ছাত্র মেধাবী ও শ্রমশীল হয় না। গ্রীষ্মের অবকাশ আছে বটে, কিন্তু সকল দেশ দার্জিলিং নহে ; এবং নহে বলিয়া অবকাশ দেওয়া হইয়া থাকে। তথাপি কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপকগণের নিকট গবেষণা আশা করা অন্যায় নহে।

কি কারণে এদেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না, তাহার পর্যালোচনা আবশ্যক হইয়াছে। ডাঃ বসু কিংবা ডাঃ রায় কিংবা তাঁহার দুই চারিজন ভাগ্যবান্ ছাত্রের দ্বারা দেশের দশা ফিরিতে পারে না। সকল বিষয়েই মধ্যম লইয়া বিচার করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিধানে ছাত্রের জ্ঞান পূর্বাপেক্ষা গাঢ় হইতেছে। এখনও ইহার ফলভোগের সময় আসে নাই, কিন্তু অধিক প্রত্যাশার হেতুও দেখিতেছি না। এই নূতন বিধানও আমাদের দোষে সম্যক্ ফলদায়ক হইতেছে না। অধিকাংশ বিজ্ঞানশালায় ছাত্রেরা চর্বিত-চর্বণ করে, যে বিষয়ের অধ্যাপনা হইয়াছে, যাহা ছাত্রেরা শুনিয়াছে দেখিয়াছে, তাহারই পুনরাবৃত্তি করে। ইহাতে তাহাদের হাত আসে, কিন্তু বুদ্ধি আসে না। হাত আনা চাই না, নহে ; কিন্তু কেবল অভ্যাস উদ্দেশ্য নহে। বহু বহু ছাত্র চোখ বুজিয়া অভ্যাস করে ; অধ্যাপকের উপদেশ শুনিয়া কিংবা কর্মপুস্তকে মুদ্রিত উপদেশ পড়িয়া যথাযথ-ভাবে এ দ্রব্যের সহিত সে দ্রব্যের যোগাযোগ করে। অর্থাৎ তাহারা অনুকরণে দক্ষ হয়, প্রকরণে হয় না। বলা বাহুল্য, প্রকরণের সঙ্গে সঙ্গে কর্মে অভ্যাস

জন্মিতে পারে। কলেজের প্রথম বর্ষ হইতে ছাত্রকে গবেষণায় প্রবৃত্ত করিতে পারিলে তাহার কর্মশক্তি ও আত্মপ্রত্যয় জন্মে, শিক্ষায় উৎসাহ হয়। কখনও কোন ছেলেকে মকৃষ করিতে ব্যগ্র দেখিয়াছেন কি? দেশের ছুতারের ছেলে কি বাটালি করাত লইয়া কিছুদিন হাত করে, না প্রথম হইতেই ছোট ছোট কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্য গড়ে, কিংবা পিতার সাহায্য করে? যত্ন করিলে আমিও পারি, আমিও মানুষ; এই প্রত্যয় দৃঢ় হইলে আর কিছু দেখিতে হয় না। অন্ততঃ জ্ঞানান্বেষণা, গবেষণার নামে ভয় ঘুচিয়া যায়। অবশ্য, কথাটা বলা যত সোজা, কথার মতন কাজ করা তত সোজা নহে। তথাপি এই আদর্শ ধরিয়া চলিতে চলিতে উপায়ও আসিতে পারিবে।

বস্তুতঃ, আমরা যে বিজ্ঞানের অন্বেষণ করিতেছি, তাহা ধনশালী ইয়ুরোপের বিজ্ঞান। বিজ্ঞানশিক্ষা ব্যয়সাধ্য; ইয়ুরোপে ও আমেরিকায় যেখানে ছাত্রের শিক্ষার সম্যক্ ব্যবস্থা আছে সেখানে আরও ব্যয়সাধ্য। অথচ আমরা সে দেশের সিদ্ধির সহিত এদেশের কৃত কর্মের তুলনা করিতে চাই। বামুনের গরু সুলভ নহে। অবশ্য এমন বিষয় আছে, যাহার এষণায় প্রচুর অর্থব্যয় আবশ্যক হয় না। নাই হউক; কিন্তু যে ছাত্রের অন্নচিন্তা চমৎকারা তাহার নিকট অন্য চিন্তা উপহাস্য নহে কি? কি কায়ক্লেশে অধিকাংশ ছাত্র বিদ্যা অভ্যাস করে, তাহা ত আমাদের অজ্ঞাত নহে। আগে প্রাণৈষণা, তার পর অন্য কথা। প্রাণৈষণার পর ধনৈষণা স্বাভাবিক। আমরা চাই জ্ঞানৈষণা। আমরা চাই, আমাদের ছাত্রেরা ধন-মান তুচ্ছ করিয়া, মরি-বাঁচি পণ করিয়া জ্ঞানমার্গে ধাবিত হউক। কিন্তু, চাইলেই আকাশের চাঁদ হাতে চলিয়া আসে না। যে সমাজ জ্ঞানৈষণার আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু উপায় করে না, সে সমাজের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। এই ঘোর কলিকালে, জ্ঞানার্গে জ্ঞান-অর্জন, ধর্মার্গে ধর্ম-আচরণ কদাচিৎ সম্ভবে। সত্যযুগেও বিনা আয়োজনে বিনা ব্যয়ে যজ্ঞ সমাধা হইত না। অন্যকে যজ্ঞকারীকে

ঋত্বিক্‌গণের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইতে হইত। যখন সমাজকে জিজ্ঞাসা করে, কেন তাহাকে অনশনে নিষ্কাম ব্রতের আদেশ হইতেছে, কেন কেবল সে "চৌর্যাপরাধে অভিযুক্ত" হইয়াছে, কেন সে উকীল-হাকিম হইয়া অপর দশজনের তুল্য সংসারধর্ম প্রতিপালন করিবে না, তখন সমাজের উত্তর কি আছে, জানি না।

বিজ্ঞানার্থী ছাত্র নির্ধন, দেশও নির্ধন; ধন-সাধ্য বিজ্ঞান তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানের উদ্দেশ্য—ছাত্রকে কেবল বিনয় ও জ্ঞানদান নহে। সে উদ্দেশ্য হইলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রকে আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত একটি দুইটি বিষয়ে আবদ্ধ রাখিতেন না, বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় শিখিবার, মনে রাখিবার পরীক্ষা করিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রগণকে এক এক বিষয়ে প্রাজ্ঞ করিতে অভিলাষী। বিলাতে যাহা সম্ভাবিত হইয়াছে, এদেশেও তাহা হইবে, এই আশায় বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, সে আশা সম্যক্‌ ফলবতী হইতেছে না। দেশের প্রজা উত্তম হউক, বিদ্বান্‌ হউক, জ্ঞানী হউক, প্রথমে এই কামনা। কেহ কেহ এক এক বিষয়ে প্রাজ্ঞ হউক, ইহা দ্বিতীয় কামনা। প্রথমে সমাজদেহ পুষ্ট ও বলবান্‌ হউক, তার পর আবশ্যক অঙ্গ হউক। এই ভাবে দেখিলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম হইতেই প্রাজ্ঞ উৎপাদনের ব্যবস্থা না করিলে ভাল হইত। প্রজাবর্গ সামান্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, ইহা অবশ্য দেখিতে হইবে। এই নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের মিলন বাঞ্ছনীয় হইতেছে। সাধারণের নিমিত্ত বিশেষ-বিদ্যা বিশেষ-বিজ্ঞান অনাবশ্যক মনে হইতেছে।

সমাজের সহিত এই কথার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এখানে সে সম্বন্ধ-প্রদর্শনের লোভ ত্যাগ করিয়া উপস্থিত প্রসঙ্গ অনুসরণ করি। বিলাতে বিজ্ঞানার্থে বিজ্ঞান-চর্চা আছে, এই চর্চার নিমিত্ত যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে;

আর আছে ধনার্থে বিজ্ঞান-চর্চা। সে দেশে তিন শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আছেন। কেহ জ্ঞানার্জনেই জীবন যাপন করিতেছেন, সে জ্ঞানের প্রয়োগ দেখিতেছেন না ভবিতেছেন না। ইহাঁরা বৈজ্ঞানিক সন্ন্যাসী। এরূপ সন্ন্যাসী কোনও দেশে অধিক হইতে পারেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক কলাশালায় কলার উন্নতি সাধনের ও ব্যয়-লাঘবের চিন্তা করিতেছেন। ইহাঁরা নিজেদের জ্ঞান দ্বারা কলাস্বামীর সেবা করিতেছেন, এবং তদ্দ্বারা ধনোপার্জন করিতেছেন। তৃতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক স্বয়ং কলাস্বামী। ইহাঁরা অভ্যস্ত বিজ্ঞান কলায় প্রয়োগ করিয়া ধনোপার্জন করিতেছেন। স্বামী ও কর্মী দুই-ই হইতে হইলে কেবল বিজ্ঞানে কুলায় না; স্বামিত্বের ও প্রবর্তনের জ্ঞানও প্রচুর আবশ্যক হয়। এদেশে আমাদের বৈজ্ঞানিক ছাত্রদিগের নিকট এই তিন ক্ষেত্রের একটাও নাই। দেশে এমন কল-কারখানা নাই, যাহার স্বামী বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত করিতে পারেন। এক যে ঔষধকরণশালা হইয়াছে, তাহাতে কয়েকজন কৃতী কৈমিতিক নিযুক্ত আছেন। কারখানা থাকিলেও বৈজ্ঞানিকের কর্মাভ্যাস এমন নাই যাহাতে কলার উন্নতি সাধিত হইত। এই কারণে কয়েক বৎসর হইতে কয়েকজন সদাশয়ের চেষ্টায় ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানে কলা ও মূর্ত-বিজ্ঞান শিখিবার নিমিত্ত আমাদের শিক্ষিত যুবক যাইতেছেন। কয়েকজন কৃতকর্মা হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আমরা ফলে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। আমার মনে হয়, কর্তৃপক্ষ দুই বিষয়ে যথোচিত মনোযোগী হন নাই। প্রথম এই, কলা-বিজ্ঞান শিখিলেই কলা স্থাপিত হইতে পারে না। দ্বিতীয় এই, দেশ না দেখিয়া, বিদেশে-শেখা কলাবিজ্ঞান সহজে কার্যকরী হয় না। বস্তুতঃ কলা-প্রতিষ্ঠার চারি পাদ আছে। ধন, নির্বাহন, কলাজ্ঞান, ও উপাদান। এই চারি পাদের একটির অভাব ঘটিলে কলা চলে না। যুবকেরা কলাজ্ঞান লাভ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। কিন্তু অপর

তিন পাদ পূর্ণ করিবে কে? আমরা নানা সময়ে, প্রায় সর্বদা, কলাবিজ্ঞান-শালা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত দেশের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু অন্য তিন পাদ কোথা হইতে জুটিবে তাহা ভাবিতেছি না। বোধ হয় এখন আমরা বুঝিতেছি, হঠাৎ কিছু করিতে পারা যায় না; দেশে একটা কিছু করিতে গেলে অন্য কিছুও করা আবশ্যক হয়।

অথচ নিশ্চিন্ত মনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও দেশে বিজ্ঞান-বিস্তার ঘটিবে না। যখন বিজ্ঞান-বিস্তার খুজি, তখন কেবল জ্ঞান-মার্গে চলি না। বিজ্ঞানের সাহায্যে দেশের ধন-বৃদ্ধিও খুজি। এই কথায় কেহ কেহ চমকাইতে পারেন। তাহাঁরা বিজ্ঞানের পদচ্যুতির শঙ্কায় কাতর হইতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? বিজ্ঞানালোচনার আনন্দে যাহার দিন চলে না, তাহাকে বিজ্ঞানার্থে বিজ্ঞান বলায় নির্দয়তা হয় না কি? বিদ্যার্থে বিদ্যা কথাটায় নিষ্কাম ব্রতের উচ্চ ধ্বনি শুনিতে পাই বটে, কিন্তু যে সংসারে বাস করিতেছি, সেটা অগ্রাহ্য করা বুদ্ধিমানের যোগ্য নহে। আমাদের ছাত্রেরা কি শিশু নির্বোধ যে তাহারা হিতাহিত বিবেক করিতে পারে না? তাহারা কি মনে করে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাইবার অন্য পন্থা নাই বলিয়াই কলেজের দ্বারস্থ হইয়াছে? তাহারা জানে, ডিগ্রি না পাইলে বৃত্তিহীন হইয়া অর্ধাশনে থাকিয়া ঘরে-বাহিরে লোক-গঞ্জনায় দিন কাটাইতে হইবে। যখন পিতা-মাতা ভ্রাতা-ভগিনী কাতরস্বরে বলেন, "হায় সে ফেল হইয়াছে", সে বৈজ্ঞানিক হইল না, মূর্খ হইয়া রহিল, এই শোকে কি হাহারব করেন? সকাম হইয়া ধর্মাচরণ করিলে ফল হয় না, ইহা বিশ্বাস করি না। যে কাজ করিয়া ধন-মান লাভ হয় না, সে কাজে কয়জন অভিনিবিষ্ট হইতে পারে? কবিসিংহ মনে মনে কাব্য রচনা করিয়া কিংবা নির্জনে লিখিয়া নিজে পড়িয়া তৃপ্ত হন না; ধনের আশা না করিলেও যশের আশা করেন, কাব্য ছাপাইয়া প্রচারিত করেন। "নিষ্কাম"

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা যশের আশা করেন, নতুবা প্রতিদ্বন্দ্বীর ঈর্ষাভাগী হইতেন না। যিনি সৌভাগ্য-সম্পৎকরী সকল-বিভবসিদ্ধি বাগ্‌দেবীর পূজা করেন, তিনি বিদেশে মান্য স্বদেশে ধন্য হন। পরা বিদ্যা নির্জনে সাধনীয়া; অপরা বিদ্যা লোকসমাজের হিতের নিমিত্ত, নিজেরও হিতের নিমিত্ত, এ কারণ শিক্ষণীয়া। 'বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে', ইহা আমাদেরই দেশের নীতি; আর আমরাই 'বিদ্যাং দেহি ধনং দেহি যশো দেহি' বলিয়া দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিই। বিদ্যাহীন মানুষ পশুর সমান, এ কথা সবাই জানে। বিদ্যা চাই নতুবা বাঁচিতে পারি না। জ্ঞানের গরিমা অবশ্য আছে। জ্ঞানের নিকট সংসারের মান-অপমান কিছুই নহে। কিন্তু জ্ঞানীর জীবন-সংগ্রাম অলীক মায়া নহে।

মূর্ত-বিজ্ঞান-সাহায্যে আজি-কালি কি অভাবনীয় কাণ্ড সাধিত হইতেছে, তাহা আমাদের অবিদিত নাই। বিলাতী দীপশলা হইতে তড়িৎ-দীপের উদ্ভাবনা পর্যন্ত চিন্তা করিলেই মাথা ঘুরিয়া পড়ে। শস্ত্র-চিকিৎসায়, বিষের প্রতিষেধে, অণুজীব-ধ্বংসের উপায়ে নূতন যুগ প্রবর্তিত হইয়াছে। বিলাতী মূর্ত-বিজ্ঞান বিশেষতঃ মূর্ত-কিমিতি ও চিকিৎসা-বার্তার উন্নতি নিমিত্ত বহু বহু লোক অহোরাত্র পরিশ্রম করিতেছেন।

অমূর্ত-বিজ্ঞান হইতে মূর্ত-বিজ্ঞানের জন্ম। কিন্তু মূর্ত-বিজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া অমূর্ত-বিজ্ঞানের প্রসার বাড়িয়াছে। প্রকৃতির শক্তি কাড়িয়া লইতে হইলে সে শক্তির পরিচয় প্রথমে চাই। গেলিলিও লণ্ঠন দুলিতে দেখিয়া দোলকের দোলনসূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানভিক্ষু ছিলেন। তাহাঁর আবিষ্কারে সংসারের কি হিত হইবে, তাহা তিনি ভাবেন নাই। অন্য দিকে, টেলিগ্রাফের ইতিহাস স্মরণ করুন। ভল্টা তাড়িত-প্রবাহ আবিষ্কার করিলেন। তাহার পর কেহ চুম্বকের প্রতি তাড়িত-প্রবাহের ক্রিয়া দেখাইলেন। টেলিগ্রাফি সৃষ্টি হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার প্রয়োজন

হইল। নূতন পরিমাণ-যন্ত্র, সূক্ষ্মযন্ত্র, সূক্ষ্মমান প্রভৃতি আবশ্যক হইল। ক্লার্ক-মার্কস্‌বেল এই ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে ঈথরের তরঙ্গ সিদ্ধ করিলেন। ইহা হইতে ক্রমে বিনা তারে বার্তা-প্রেরণ সম্ভাবিত হইয়াছে। অমূর্ত-বিজ্ঞান নূতন কিছুর সংবাদ শোনায়; মূর্ত-বিজ্ঞান তাহার প্রয়োগ বৃদ্ধি ও পুষ্টি করে। একের সহিত অন্যের এই অভেদ্য বন্ধন আছে বলিয়াই আমরা বিজ্ঞান বিজ্ঞান রব করিতেছি।

বিজ্ঞান দ্রব্য গড়ে না, কলা দ্রব্য গড়ে। বিজ্ঞান কলাকে গড়িবার সন্ধান বলিয়া দেয়। বিজ্ঞান জ্ঞান লইয়া সন্তুষ্ট, কলা-বিজ্ঞান (কলা অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান) জ্ঞান ও কর্মের যোগ ঘটায়। কৃষি চিকিৎসা প্রভৃতির অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান, বার্তা-বিজ্ঞান। কলা-বিজ্ঞান ও বার্তা-বিজ্ঞান মূর্ত-বিজ্ঞান। অমূর্ত-বিজ্ঞান বিস্তীর্ণ, জগৎব্যাপী; আকাশের নাড়ী-নক্ষত্র হইতে পাতালের নীচে কূর্ম ছিল কি না, তাহার অনুসন্ধান করে। এই বিশাল বিজ্ঞানের মধ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িতে হয়। এই কারণে বিজ্ঞানের নানা শাখা-কল্পনা। ইহাদের মধ্যে কিমিতি-বিজ্ঞান ও ভৌতিক-বিজ্ঞান অন্য শাখারও উপস্তম্ভ। এই দুই বিজ্ঞান অধিকাংশ মূর্ত-বিজ্ঞানের আদি। মূর্ত-বিজ্ঞান ক্ষুদ্র; আমার তোমার যাহাতে হিত হইতে পারিবে তাহার বিজ্ঞান। এই কারণে, খণ্ডিত। কিন্তু অধিকারী-ভেদ ত আছে। যে জ্ঞান কেবল জ্ঞান না থাকিয়া ফলদায়ক হয় এবং যাহা লাভ করিতে ছাত্রের উৎসাহ হয়, তাহা মূর্ত-বিজ্ঞান হউক, কলা-বিজ্ঞান হউক, তাহা হিতকর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকাল কলেজ, টিচার-ট্রেনিং কলেজ, ল-কলেজ, এ সব কলেজের ছাত্রদিগের জ্ঞান ও বিনয় হয় না, বলিতে পারি না। ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকাল কলেজ ধরুন। এখানে বার্তার আবশ্যক নানা বিজ্ঞান শেখান হয়, সবই খণ্ডিত; মেডিকাল কলেজে সুস্থ দেহের রক্ষা ও রুগ্ন দেহের আরোগ্য এই দুই বিষয় লইয়াই বিশাল বিজ্ঞান শেখান হয়।

কিন্তু এই দুই কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্র ও অমূর্ত-বিজ্ঞান-কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রের তুলনা করুন। শেষোক্ত ছাত্র জীবন-সংগ্রামের যোগ্য নহে। বিশ বৎসরের যুবক বি এ, বিএস্-সি পাশ হইয়া খণ্ডিত জ্ঞানের ফলে সংসার-ধর্মে অনভিজ্ঞ থাকে।

বিলাতের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে মূর্ত-বিজ্ঞান শিখিবার কলেজ আছে অমূর্ত-বিজ্ঞান শিখিবারও আছে। জর্মানীর বর্তমান আস্পর্ধা ও বাহ্বাস্ফোটে অমূর্ত-বিজ্ঞান-চর্চার পরিধি পাওয়া যাইতেছে। বার্তাশ্রয়-বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচুর আয়োজন সত্ত্বে চারি বৎসর পূর্বে বার্লিনে জর্মান সম্রাট নিজের নামে এক "ইন্‌ষ্টিটিউট্" প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের যাবতীয় কলার ও বার্তার বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল দৃঢ় ও পুষ্ট করিয়াছেন। চরক বলিয়াছেন "সম্যক্ প্রয়োগং সর্বেষাং সিদ্ধিরাখ্যাতি কর্মণাম্"—সর্বকর্মে সম্যক্ প্রয়োগ করিতে পারিলে সিদ্ধি বলা যায়। পূর্বকালে আমাদের দেশে মূর্ত-বিজ্ঞান-বলে বার্তা ও কলার উত্তম সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। প্রাচীন কালে যজ্ঞকুণ্ড নির্মাণে শুল্ব-সূত্রের আরম্ভ হইয়াছিল, ক্ষেত্রবিভাগে ক্ষেত্র-তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। নীচের সোপান হইতে উচ্চে উঠিতে বাধা হয় না। তেমন মূর্ত-বিজ্ঞান শিখিলে অমূর্ত-বিজ্ঞান শিখিতে বাধা হয় না।

অতএব দাঁড়াইল এই, অমূর্ত-বিজ্ঞান যিনি শিখিতে চান শিখুন, কিন্তু মূর্ত-বিজ্ঞান শিখিবার আয়োজন আবশ্যক। মূর্ত-বিজ্ঞান দ্বারা অমূর্ত-বিজ্ঞান-জাত বিনয় লাভ হইবে, লৌকিক জ্ঞান হইবে, আর সেই জ্ঞান প্রকৃত হইবে। ইহাতে পারগ ছাত্র হাকিম হউন, উকিল হউন এই দেশের সম্পর্কে থাকিবেন, তাঁহার অধীত বিদ্যার প্রয়োগের সুযোগ পাইবেন, এবং যত্ন করিলে মূর্ত মার্গ ধরিয়া অমূর্ত মার্গে উপস্থিত হইতে পারিবেন। ফলে দেশে বিজ্ঞান-বিস্তার হইবে। এত দিন অমূর্ত-বিজ্ঞান শিক্ষার ফল দেখা গেল; এখন মূর্ত-বিজ্ঞান শিখিলে কি হয়, তাহাও ত দেখা কর্তব্য।

দেশে বিজ্ঞান-প্রচারের তৃতীয় অন্তরায় বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা। এই বিদেশী ভাষা, ইংরেজী ভাষা, এত কঠিন যে, শৈশব হইতে যৌবন পর্যন্ত দশ বার বৎসরের যত্নে ও শ্রমে যৎকিঞ্চিৎ আয়ত্ত হয়। মস্তিষ্কের শক্তি অফুরন্ত নহে, আমাদের বয়সও নহে। এই ভাষা শিখিতে আমাদের কত রক্ত জল হইতেছে, কত শক্তি তাপ হইতেছে, তাহা চিন্তা করুন। অথচ এই বিদেশী ভাষা শিক্ষা আমাদের কাম্য নহে ; কাম্য বিজ্ঞান। কাম্যের চতুর্দিকের কণ্টকের বেষ্টন ভেদ করিতেই শক্তি-সামর্থ্য ক্ষয় পাইতেছে। ইহাও সহ্য হইত ; মাতৃভাষায় না শেখাতে বিদেশী বিজ্ঞান বিদেশী থাকিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু বলিতে কিছু লিখিতে হইলে বিদেশী ভাষায় বলিতে লিখিতে হইতেছে ; চিন্তা করিতে হইলেও বিদেশী শব্দ-মূর্তির উপাসনা করিতে হইতেছে। কারণ, অন্য সাধন জানা নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে, সভাসমিতি আপিশ-আদালতে যাইতে হইলে গৃহ-বেশ ত্যাগ করিয়া যেমন সভ্যবেশ পরিধান করি, এবং সেখান হইতে আসিয়াই সে বেশ-ত্যাগে সুস্থ বোধ করি, আমাদের পক্ষে বিজ্ঞানও তেমন হইয়াছে। উহা দেশের ধাতুতে মিশিতেছে না, বাহিরে বাহিরে শোভা-সম্পাদনের নিমিত্ত থাকিতেছে। ইংরেজীতে বিজ্ঞান শিখিতে ছাত্রের যত বৎসর লাগিতেছে, মাতৃভাষায় শিখিলে অর্ধেক সময় লাগিত না। এখানে এক বৃত্তান্ত উল্লেখ করিতেছি। কয়েক বৎসর আমাকে কটকের মেডিকাল ইস্কুলে কিমিতি-বিজ্ঞান শিখাইতে হইয়াছিল। ছাত্রদিগের শিক্ষণীয় বিষয় অল্প ছিল না ; এখনকার আই,-এস্ সি, পরীক্ষার নিমিত্ত যতখানি আছে প্রায় ততখানি ছিল। ছিল না কর্মাভ্যাস। কিন্তু কুড়ি দিনের মধ্যে অধ্যাপনা শেষ করিতে হইত। আমরা কলেজে কত কুড়ি দিন দিয়া থাকি, তাহা সবাই জানি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশে অন্যূন সাতকুড়ি দিন অধ্যাপনা করিতেছি। এই প্রভেদের প্রধান কারণ, ভাষার প্রভেদ। মেডিকাল

ইস্কুলের ছাত্র মাতৃভাষায় শিখিত। দেখিয়াছি, ইংরেজীতে যাহা এক ঘণ্টা ছাত্রের হৃদ্গত করিতে পারি নাই, অল্প বাঙ্গালা কথায় তাহা অক্লেশে পারিয়াছি। জল কেন ছাঁকি, কি কাজে কেমন ছাঁক্‌নি চাই, ইত্যাদি হাজার বলি, এক "ফিল্‌টার" শব্দে একটা বিদেশী অজানা অদেখা বস্তুর আব-ছায়া মনে ভাসিতে থাকে। বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যে বয়সে যত বিদ্যা আয়ত্ত করে, সে বয়সে তত বিদ্যা আমাদের ছাত্রেরা পারে না। ইহার কারণ বিদেশী ভাষা। এই যে ভাষা-বিভীষিকা যাহার জন্য আমাদের ছাত্রদিগের দেহ-মন জড়ভাবাপন্ন হইতেছে, ইহার প্রতিকার কি হইবে না? ইংরেজী ভাষা, বিদেশী ভাষা, শিখিলে হিত হয় না, কিংবা বিনয় অভ্যাস হয় না, এমন বলি না। বলি, কি মূল্য দিয়া এই হিত ক্রয় করিতেছি? মাতৃভাষায় শিখিলে বিজ্ঞানের তত্ত্ব মনে গাঁথা হইয়া যায়, বিদেশী ভাষায় গাঁথিতে বহু সময় লাগে। আরও দেখুন, বিদেশী ভাষা হেতু শিক্ষার ফল দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে না। বিজ্ঞান জনকয়েকের অধিকৃত থাকিতেছে, সকলের ভোগে আসিতেছে না।

কৃষিবার্তা দ্বারা বিজ্ঞান-প্রচার।

দেশে বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছাত্রগণের প্রতি দৃষ্টি প্রথমে পড়ে। চারি পাঁচ বৎসর যথোচিত যত্ন ও শ্রম করিয়া যে বিজ্ঞান আয়ত্ত হয়, তাহা সংসারে প্রবেশ মাত্র পরিত্যক্ত হইতে পারে, ইহা প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস হইত না। দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ প্রকৃত নহে, কিংবা কাল-বৈগুণ্যে অনুরাগ স্থায়ী হয় না।

বিলাতে অপরেও বিজ্ঞানের বহু বিষয় আলোচনা করেন। এক এক জন লব্ধকাম হইয়া প্রাজ্ঞ হন। এদেশে এরূপ লোক অত্যল্প। কিমিতি-বিজ্ঞান কিংবা ভৌতিক-বিজ্ঞানের তুল্য অমূর্ত বিজ্ঞানের চর্চা নিমিত্ত

সজ্জিত কর্মশালা আবশ্যক। কিন্তু বিজ্ঞানের অনেক শাখা কেবল ভূয়োদর্শনে পুষ্ট হয়। এমন কি, কেহ কেহ বিজ্ঞানকে পরিসংখ্যা-বিদ্যাও বলিয়াছেন। উদ্দেশ্য অনুসারে বৃত্তান্ত-সংগ্রহের নাম, পরিসংখ্যা। বস্তুতঃ পরিসংখ্যা ব্যতীত ভূয়োদর্শন সম্পন্ন হয় না। বিনা গণিতে বিনা দূরবীক্ষণে জ্যোতির্বিদ্যা, বিনা যন্ত্রে আবহ-বিদ্যা, বিনা উপকরণে উদ্ভিদবিদ্যা কীট-পতঙ্গ-মৎস্য-পক্ষী-বিদ্যা, বিনা খনিত্রে ভূপৃষ্ঠবিদ্যা, প্রভৃতির এক এক অংশ সম্যক্ সাধিত হইতে পারে। আজিকালি বাঙ্গালী দেশভ্রমণ করিতেছে। কখনও রোগের তাড়নায়, কখনও অবকাশের তাড়নায় স্থানান্তরে যাইতেছে, কোথাও দুই এক মাস প্রবাস করিতেছে। এই সময় নিজের দেশের গ্রামের সহিত নূতন দেশের গ্রামের তুলনার সুযোগ আপনি হয়। উদ্দেশ্য অভিমুখে চলিতে অভ্যাস করিলে বিধেয় আপনি চোখে পড়ে। জ্ঞানৈষণা দোসর করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পরিসংখ্যানও সিদ্ধ হয়।

যাহাঁদের নিমন্ত্রণে আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহাঁদের ইচ্ছা আমরা দেশে কৃষি-জ্ঞানের প্রচার চিন্তা করি। তাহাঁদের ইচ্ছা অবশ্য পূরণীয়। কিন্তু বিষয়-গৌরব স্মরণ করিয়া বিমূঢ় হইতেছি। যে বার্তা আমাদের প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে চারি জনের এক-মাত্র জীবিকা, সে কৃষি-বার্তার অভ্যুদয়-চিন্তা কদাপি অধিক হইতে পারে না। ইহা ভাবিয়া কৃষি উপলক্ষ্য করিয়া আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি।

কৃষিকর্মে যে বিজ্ঞান আবশ্যক, অথবা কৃষিকর্মের অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। ইহা মূর্ত-বিজ্ঞান, এক স্বতন্ত্র বিজ্ঞান নহে। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান ইহার অমূর্ত আকার। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানেও অপর সমুদয় বিজ্ঞান আবশ্যক হয়। আকাশ হইতে পাতালের স্থাবর-অস্থাবর সকল দ্রব্যের কোন স্থলে গভীর কোন স্থলে অগভীর জ্ঞান আবশ্যক হয়। মৃত্তিকা-জল-বায়ুর ভৌতিক-বিজ্ঞান, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গের স্বভাব-নির্ণয় প্রভৃতি হইতে

উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান পৃথক্ করিতে পারা যায় না। তথাপি বৃক্ষের জীবনধারণ, বর্ধন, পোষণ, সন্তানজনন প্রভৃতি ব্যাপার ভৌতিক জড়ধর্ম বলিয়া অদ্যাপি প্রমাণিত হয় নাই। বস্তুতঃ যখনই জন্ম-মরণ বলি তখনই এক অজ্ঞাত অনির্দিষ্ট, বোধ হয় চির-অজ্ঞেয়, সত্ত্ব স্মরণ হয়। বাহ্য-প্রকৃতি অর্থাৎ ক্ষেত্র জীবকে কতদিকে নিয়মিত করিতেছে, তাহারই মধ্যে জীব জন্মিতেছে বাড়িতেছে মরিতেছে, কিছু রাখিয়াও যাইতেছে। ইহার তুলনায় ভানুমতী-বাজি কিছুই নয়। কৈমিতিকের গোটা দশ-বার মূল পদার্থ পাইলে বৃক্ষ জীবিত বর্ধিত ফলপ্রসূ হইতে পারে, কিন্তু কিমিতি বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু আছে।

সেটা কি, কে জানে। কিন্তু জানি সর্ষপবীজ ও বটবীজ একক্ষেত্রে উপ্ত হইলেও সর্ষপ ও বটবৃক্ষ এক হয় না। কৃষক ভূয়োদর্শনে ভর করিয়া শস্য জন্মাইতেছে, বীজ সংগ্রহ করিতেছে, মাটি বিচার করিতেছে, বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিতেছে, ক্ষেত্র বীজাঙ্কুরোৎপত্তির যোগ্য করিতেছে, বৃক্ষের শত্রু বিনাশ করিতেছে, নবজাত বৃক্ষশিশু পালন করিতেছে। মাটি-জল-বায়ু ও রবিকর-তেজ অব্যাহত রাখিয়া ফলের প্রত্যাশা করিতেছে, একটী বীজ হইতে বহু পাইতেছে। বীজের সেটা কি শক্তি যাহাতে তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াও পূর্ণ থাকিতেছে? যে সর্ষপ সে সর্ষপ, যে বট সে বট থাকিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বহু হইতেছে। জীবন দ্রব্যগুণ ত বলিতে পারি না।

অথচ সরিষা-ক্ষেতের দুইটি সরিষা গাছ অবিকল এক নহে, আম-বাগানের সব গাছের আম সমান বড় সমান মিষ্ট নহে। তবে, বৃক্ষের আকার-প্রকার স্বভাব-চরিত্র পরিবৃত্তিশীলও বটে। দেখিলে বোধ হয়, প্রকৃতি জাতিভেদ করেন নাই; আমরা করিয়াছি। আমাদের স্বল্প জ্ঞানে ভেদাভেদ আসিয়াছে। যাহা বিজ্ঞান বলি, বিজ্ঞানের সূত্র বলি, তন্ত্র বলি, তাহা মানুষের কল্পিত রচিত; প্রকৃতির তন্ত্র আমরা জানিতে চাই, জানিতে পারিতেছি না।

এ কথা প্রাণী সম্বন্ধেও সত্য। শ্রেষ্ঠ প্রাণী সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন হইয়া এক

সত্ব। ইহার আয়ু নির্দিষ্ট আছে। ইহার যাবতীয় অঙ্গ সেই একের জীবন-নির্বাহ করিতেছে, রক্ষা করিতেছে। একটা অঙ্গ ছিন্ন হইলে উহা বিকলাঙ্গ হয়, হয়ত মরিয়া যায়। ছিন্ন অঙ্গ গজায় না, বাড়ে না, আর একটা সত্বের উৎপত্তি করে না। গাছের এরূপ নহে। গাছের আয়ু স্থির নাই; উহার ডাল মাটিতে পড়িলে গজায়, পাতা ফুল ফল ধরে, বীজ উৎপাদন করে। অথচ উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদেহের যে ভূত-পদার্থে জীবন ব্যক্ত হইতেছে সে প্র-পঙ্ক কৈমিতিক উপাদানে ও প্রাকৃতিক লক্ষণে এক বোধ হইতেছে।

ফলোৎপত্তির পক্ষে বীজ প্রধান কি ক্ষেত্র প্রধান, তাহা লইয়া পূর্বকাল হইতে একাল পর্যন্ত বিলক্ষণ বিতর্ক চলিতেছে। বৃক্ষের, ইহার ডাল-পালার ফুল-ফলের বীজের স্থিরতা আছে, নাই-ও। ইহা নিত্য দেখিতেছি। একের মধ্যে বহুরূপতার দৃষ্টান্ত জীবেই পাই। যখন ডাল হইতে গাছ হয়, এবং বহু বৃক্ষ বীজ বিনা অরণ্য হইয়া পড়ে, তখন বীজোৎপত্তির বিচিত্র ব্যবস্থা কেন হইয়াছে? ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় পশু-বর্ধক ও বৃক্ষ-বর্ধক, জনক-জননী নির্বাচন করিয়া, কখনও বা ক্ষেত্র নির্বাচন করিয়া অদ্ভুত অদ্ভুত সন্তান জন্মাইতেছে। পিতা-মাতা হইতে সন্তান কি কি গুণ হরণ করে, তাহার পরিসংখ্যান সমাপ্ত হইতে বিলম্ব আছে। এই হারিতার কারণ কি, কে জানে? এ বিষয়ে কে কি বলেন, তাহার বাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। জন্মদ হইতে জাতের প্রভেদ হয়, জাত অধিক হয়, সকলের খাইবার থাকিবার সম্ভাবনা হয় না, যোগ্যের জয় হয়, এবং যে পরিবৃত্তি-হেতু জয় তাহার কিছু কিছু হারিত হয়। এসব কথা জীব-বিজ্ঞানে পুরাতন হইয়া গিয়াছে। যোগ্যের জয় বলি, প্রাকৃতিক নির্বাচন বলি, এসব কথার কথা মাত্র। অসৎ হইতে সতের উদ্ভব হয় না, যাহা নাই তাহার সঞ্চার হইতে পারে না। অতএব বীজে কিছু থাকে যাহা হেতু জাত জীব জন্মদের সদৃশ হয়, অন্য কিছু থাকে যাহা হেতু সদৃশ হয় না। শেষোক্ত কিছুকে দৈব বলা হয়।

কিন্তু কথা এই, সন্তানে যে পরিবৃত্তি লক্ষিত হইল তাহা পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে বাড়িয়া চলিতে পারে কি ? মাঠে হাজার মূলা গাছের মধ্যে দশটা পুষ্ট হয়, সে দশটার বীজ হইতে জাত মূলা আরও পুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ ফুলিয়া কলাগাছের মতন মোটা হইতে পারে কি ? মানুষের বেলা এরূপ প্রশ্ন তুলিলে জিজ্ঞাস্য হয়, গাণিতিক বংশের পুত্র-পৌত্রেরা ক্রমে ক্রমে অতি-গাণিতিক হইয়া উঠিবে কি ? কিন্তু ভূয়োদর্শনে জানা যায় যে, তাহা হয় না। অষ্ট্রীয়া-বাসী মেণ্ডেল সাহেব বর্ণসংকরণে প্রচুর পরীক্ষা ও ভূয়োদর্শন দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে বর্ণ-সংকরণের ফল দৈবায়ত্ত। দৈবায়ত্ত বলিয়া কিন্তু অন্য দৈবঘটনার তুল্য সন্তানের দ্বারা জন্মদের গুণ-হরণও গণিত-বিদ্যায় সাধিত হইতে পারে, কিছু পারে না। এই যে পারে না, তাহা দৈব।

তা বলিয়া ক্ষেত্র যে কিছু নহে, এমন নহে। বরং দেখা যায়, ক্ষেত্র-অনুসারে গাছের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবৃত্তি হয়। এবং হয় বলিয়াই কৃষক ঈপ্সিত ফল প্রত্যাশা করে। বস্তুতঃ কৃষিকর্ম দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, বীজকর্ম ও ক্ষেত্রকর্ম। বীজকর্মে বীজ-নির্বাচন, বপন, অঙ্কুরোদ্গমন, জাত বৃক্ষের পালন, এবং শেষে বীজ-রক্ষণ। ক্ষেত্রকর্মে মাটির উৎপত্তি-স্থিতি, জলবায়ু ও রবি-তেজ নির্বাহ, বৃক্ষের শত্রুর বিনাশ প্রভৃতির নিমিত্ত কর্ম। ইহার এক এক কর্মে প্রচুর বিজ্ঞান আছে, অনেক গবেষণা করিবার আছে। এক মাটিই ধরি। দেখা যায়, যে মাটি স্বভাবতঃ অধম তাহাতে হাজার রসায়ন প্রয়োগ করি, তাহা কদাপি উত্তম মাটির তুল্য সুফলা হয় না। ফল সহিত বৃক্ষদেহ ভস্মীভূত করিলে মাটির প্রায় যাবতীয় উপাদান ভস্মে পাওয়া যায়। অথচ নির্দিষ্ট পদার্থ মিশ্রিত করিয়া জলে বৃক্ষ জন্মাইলে গোটা দশ বার মূল পদার্থ পর্যাপ্ত হয়। এইরূপে জানি, নাইট্রোজেন গন্ধক ফস্ফরস্ পটাসিয়ম্ মেগনিসিয়ম্ কেলসিয়ম্ লৌহ, এবং বোধ হয় সোডিয়ম্ ও ক্লোরিন্ মাটিতে না থাকিলে নয়। নাইট্রোজেন গন্ধক ফস্ফরস্ প্র-পঞ্চেক

আছে। অতএব এই তিন কেন আবশ্যক তাহা বুঝিতে পারি। সেইরূপ অক্‌সিজেন হাইড্রোজেন কার্বন কেন চাই, তাহাও বুঝিতে কষ্ট নাই। অপর কয়টা সম্বন্ধে বিজ্ঞান এখনও স্পষ্ট উত্তর দিতে পারে না। পটাসিয়ম্ বিনা বৃক্ষপত্রে পললীয় (শ্বেতসার) উৎপন্ন হয় না, কেলসিয়ম্ বিনা ব্যাপ্ত হয় না, লৌহ বিনা পত্রের রঞ্জক অর্থাৎ পলপিত্ত উৎপন্ন হয় না, এবং বোধ হয় মেগনিসিয়ম্ বিনা পলপিত্তের প্রাচুর্য হয় না। ভূয়োদর্শনে জানিতেছি, হয় না; কিন্তু ভূয়োদর্শন ত বিজ্ঞান নহে। আমাদের দেহের পুষ্টির কারণ যেমন অজ্ঞাত, ভূমির উর্বরতা শক্তি কিসে, তাহাও প্রায় সেইরূপ অজ্ঞাত। এইটুকু জানি ক্ষেত্রের ভৌতিক অবস্থার গুণে উর্বরতা।

এখানে এক বৃত্তান্ত স্মরণ হইতেছে। আমার এক উদ্‌যোগী বন্ধু কৃষি-কর্ম নিমিত্ত পাঁচ ছয় শত বিঘা জমি কিনিয়াছিলেন। সে জমিতে কি ফসল উত্তম জন্মিতে পারিবে, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে জমির কিছু মাটি বিশ্লেষণের নিমিত্ত এক কৈমিতিকের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। বিশ্লেষণ-ফল কিমিতির সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত হইয়া আসিল। এই সঙ্কেত বুঝিতে না পারিয়া বন্ধুবর বুঝাইয়া বলিতে আমায় অনুরোধ করিলেন। তখন আমার যে সঙ্কট উপস্থিত হইল, তাহা আপনারা অনুমান করিতে পারেন। মাটিতে বালি এতভাগ, আলুমিনা এতভাগ ইত্যাদি, শুনিয়া তিনি অধীর হইয়া যে প্রশ্ন করিলেন, তাহাতে আমার অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। তিনি জানিতে চান, কি শস্য উত্তম জন্মিতে পারিবে। বলা বাহুল্য, ইহার উত্তর কিমিতি-বিজ্ঞান দিতে পারে না। পরদিন জমি হইতে স্বচ্ছন্দ-জাত বৃক্ষাদি আনাইয়া দিলেন। দেখিয়া বলিলাম, ভূমি অনুর্বরা, এমন অনুর্বরা যে প্রচুর অর্থব্যয় করিলেও কয়েক বৎসর ধান কলাই ভাল জন্মিবে না। জাত-বৃক্ষের বৃদ্ধি ও পুষ্টির সহিত মাটির উপাদান মিলাইয়া দেখিলে উর্বরতা অনুমান করিতে পারা যায়, নতুবা নহে। পরে শুনিলাম বন্ধুবর এক পাহাড়ের গায়ে জমি কিনিয়াছেন।

বস্তুতঃ কৃষি-বিজ্ঞান এত অজ্ঞাত যে ভূয়োদর্শন ব্যতীত কৃষি চলিতে পারে না। এ কারণ, জমি নূতন, বীজ নূতন হইলে অর্থাৎ ক্ষেত্র ও বীজ দুইই অজ্ঞাত হইলে ভাবী ফলও অজ্ঞাত থাকে। মৃৎকুণ্ডে দুই চারিটা আখ গাছ যত্নে বর্ধিত ও পুষ্ট করিতে পারা যায়; কিন্তু বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, এবং যেটা কাজের কথা, কৃষকের বর্তমান সহায়-সম্পত্তি লইয়া পারা যায় কি না', সেটাই গুরুতর সমস্যা। সে সমস্যার পূরণ না হইলে কৃষি-বিজ্ঞান আর উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান প্রায় এক থাকিয়া যায়, কৃষিবার্তা দাঁড়াইতে পারে না। দেশের কৃষক জানে, গোবর জমির "সার"; এ কারণ সারকূড়ে সার গাদা করিয়া রাখে। গোবরের উপদান কি, তাহা জানে না; কিন্তু জানে কোন্ মাটিতে কোন্ ফসলের পক্ষে গোবর হিতকর, কিসের পক্ষে খইল হিতকর। মাঠের মাটি পরীক্ষা করিয়া জানি, জমিতে নাইট্রোজেন, ফস্ফরস ও পটাসিয়মের ন্যূনতা আশঙ্কা করিবার কথা। সব মাটিতেই কিছু না কিছু আছে, কিন্তু একটার ন্যূনতায় বৃক্ষ-জীবন-ক্রিয়া আটকাইয়া যায়। নাইট্রোজেনের সদ্ভাব কদাচিৎ হয়, এ বৎসর সদ্ভাব হইলেও পর বৎসর হয় না। কারণ বৃক্ষকে যে সোরার আকারে নাইট্রোজেন লইতে হয়, তাহা জলে ধুইয়া চলিয়া যায়, জমিতে থাকে না। এ কারণ কৃষক গোবর ও গোমূত্র এবং অন্য পশুর বিষ্ঠা-মূত্র-চর্ম ও শৃঙ্গচূর্ণ, গাছ-পচা প্রভৃতি দ্বারা নাইট্রোজেন নির্বাহ করে। বরাহের বৃহৎ-সংহিতায়, অগ্নিপুরাণে, শুক্রনীতিতে বৃক্ষায়ুর্বেদ আছে। পূর্বকালে দ্রব্য-গুণ প্রচুর আলোচিত হইয়াছিল। আমাদের আয়ুর্বেদে যে দ্রব্যগুণ বর্ণিত আছে, তাহা যে কত ভূয়োদর্শনের ফল তাহা ভাবিলে এই বিজ্ঞানের দিনেও পূর্ব-পিতামহদিগের প্রতি মস্তক আপনি নত হয়। দ্রব্যগুণ জানিলে লৌকিক কাজ চলে বটে, বিজ্ঞান-এষণা তৃপ্ত হয় না। ইহাতে কেহ মনে করিবেন না যে পূর্বকালের মানব অপেক্ষা আজি-কালির মানব অধিক বুদ্ধিশালী। স্যর ব্রালেসের প্রমাণে বলিতেছি, বুদ্ধি

পূর্বাপর সমান আছে। পূর্বেকার জ্ঞানের সহিত নূতন জ্ঞান যুক্ত হইতেছে। ইহাতেই, এই উত্তরাধিকারিত্বেই সভ্য মানবের বড়াই। পূর্বকাল হইতে "ক্ষণশঃ কণশঃ সাধিত" জ্ঞান একত্র হইয়া আধুনিক বিজ্ঞান। পূর্বে ও এখন দেশ-বিদেশে যে জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে, তাহা আমাদের সকলের ভোগে আসিবার সুযোগ হইয়াছে। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান আমাদের কৃষিকর্মে প্রয়োগ করিয়া বুঝিতেছি, গোবর ও খইলে নাইট্রোজেন ফস্‌ফরস পটাসিয়ম আছে বলিয়া জমির সার হইয়াছে। দেশের বর্তমান কৃষক হাড়ের গুণ জানে না। তাহার জানিবার প্রয়োজন ঘটে নাই। গ্রামের গবাদির হাড় গ্রামেই পড়িয়া থাকিত, দূর দেশান্তরে চলিয়া যাইত না। নদী-মাতৃকা ভূমি, যে ভূমি নদীর পলি হেতু মাতৃস্বরূপা হইয়া শস্য দ্বারা প্রজাপালন করে, তাহার গুণ আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। আমরা নদীর দুই পাশে অবিচ্ছিন্ন বাঁধ বাঁধিয়া উর্বরতা-শক্তি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতেছি। দামোদরের বন্যা বাঁধ ভাঙ্গিয়া ঘর বাড়ী ক্ষতি করে বটে, কিন্তু যে কৃষক দামোদরের পলি পায় সে অপর সার-খইল খোজে না। দেশে জ্বালানি কাঠ দুর্লভ; কৃষক গোবর না পোড়াইয়া পারে না; গোবরের নাইট্রোজেন বায়ুসাৎ হয়, তাহা জানিয়াও গোবর পোড়ায়। খইল মহার্ঘ; গরুকেই খাওয়াইতে পারে না। এই অবস্থায় প্রকৃতি-দত্ত পলির অপচয় চলে কি? নদীর পলি খাল-ডোবা বুজাইয়া দেশ ভরাইয়া উচা করে, যে মেলেরিয়া পশ্চিম-বঙ্গ উৎসন্ন করিতেছে তাহারও প্রতীকার করে। বস্তুতঃ কৃষির একটা মূল কথা এই যে, ভূমি হইতে শস্যরূপে যাহা উঠাইয়া লইবে, কোন-না-কোন আকারে প্রত্যর্পণ করিবে, নতুবা ভূমি নিঃসার হইয়া পড়িবে। অতএব দেশ হইতে তিল তিসি গম কাপাস-বীজ প্রভৃতি স্থানান্তরিত হইলে খইল কিনিয়া ভূমি-ঋণ পরিশোধ করিতে হয়।

নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরস, পটাসিয়মের ন্যূনতার শঙ্কায় ভূমিতে প্রচুর গোবর-খইল-হাড়-শিংগুড়া প্রভৃতি ঢালিলেই কর্ম নিষ্পত্তি হয় না। গোমূত্রে

মাটির তেজ বাড়ে বটে, কিন্তু অবস্থা গুণে গাছ জ্বলিয়াও যায়। জল বিনা গাছ বাঁচে না, কিন্তু আধিক্যে মরিয়া যায়। মাটির গুণে রবির তেজে শস্তের পক্ষে অধিক জল অল্প হয়; ক্ষেত্রভেদে অল্প জল অধিক হয়। রন্ধনকলায় অনভিজ্ঞ পাচক মসলার আধিক্য ঘটাইয়া ব্যঞ্জন সুস্বাদু করিতে চায়; কিন্তু যেমন মাত্রাজ্ঞ পাচক শ্রেষ্ঠ, মাত্রাজ্ঞ কৃষকও তেমন শ্রেষ্ঠ। জল ও সারের মাত্রা, বৃক্ষানুসারে মাত্রা সম্বন্ধে পরীক্ষা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু অদ্যাপি ভূয়োদর্শনে নির্ভর করিতে হইতেছে। কিসে কখন্ কোন্ শস্তের পক্ষে মাত্রা অধম, কখন উত্তম হয়, তাহার বিজ্ঞান ত জানি না।

এই কারণে বলিয়াছি আমাদের নিমন্ত্রকবর্গের ইচ্ছা শুনিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িতেছি। দেখিতেছি. কৃষিকর্মের এক ক্ষুদ্র অংশেও আমাদিগকে দৈবের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইতেছে। কিন্তু সৎক্ষেত্রে মূর্খ দ্বারাও বীজ উপ্ত হইলে উপচয় হয়। আশা এই যে আমার ক্ষেত্র সম্মুখে পশ্চাতে চারিদিকে বিস্তৃত। আমরা যে বার্তা আশ্রয় করিয়া জীবিকা করিতেছি, ক্ষেত্রস্বামিগণ তাহার উপায় বিধান করিবেন।

কৃষিবার্তা দৃষ্টান্ত করিবার আমার অপর উদ্দেশ্য আছে। (১) দেখা যায় এই বার্তা ধরিয়া দুরূহ বিজ্ঞানে প্রবেশ করিতে পারা যায়। যে সকল ছাত্র মূর্ত-বিজ্ঞান সহজ মনে করেন, তাঁহারা দেখিবেন কৃষিকর্মের এক এক বিজ্ঞান অদ্যাপি অজ্ঞাত। (২) গবেষণা জাগরিত করিবার পক্ষে কৃষি-বার্তাও সুন্দর উপায়। গবেষণা শব্দের মূলার্থ নাকি গোরু খোজা। গোরু হারাইলে লোকে খুজিতে বাহির হয়। কৃষি-বার্তায় অসংখ্য গোরু, মূল্যবান্ গোরু খুজিবার আছে, যে গুলা পাইলে আমাদের বহু মঙ্গল হইবে। চাণক্য নাকি বলিয়াছেন, 'কৃষির্যস্য ন বাণিজ্যং গাবো যস্য ন ধেনবঃ। দারিদ্র্যং সততং তস্য গৃহে তস্য কুভোজনম্॥' আমাদের গৃহে যে কুভোজন হইতেছে, তাহা ভোজন-গৃহে প্রবেশ করিলেই প্রত্যক্ষ হয়।

এই যে অভাব-বোধ হইতে গবেষণা তাহাই প্রকৃত; অন্যের দেখাদেখি যাহা তাহা কৃত্রিম। আরও দেখিতেছি কৃষি ধরিয়া প্রায় যাবতীয় বিজ্ঞান শিখাইতে পারা যায়। বিজ্ঞানের এমন শাখা মনে হইতেছে না যাহা ইহাতে কিছু-না- কিছু না লাগে। ইহাই ত প্রজাসাধারণের আবশ্যক। বিজ্ঞানের স্থূল তত্ত্ব প্রচারিত হউক, পরিচিত কৃষি-বার্তার দৃষ্টান্তে প্রচারিত হউক। দেশের আপামর সাধারণে প্রচারিত হউক; পুস্তক দ্বারা হউক, কথা দ্বারা হউক। কিন্তু দেখিবেন যেন পুস্তক ও কথা দ্বারা পাঠক ও শ্রোতার মনে বিজ্ঞানের প্রতি আদর জন্মে। তাহাঁদের জ্ঞাত বিষয় লইয়া বিজ্ঞান প্রচার করিবেন; কেন না তাহাঁদিগকে শিখাইতে হইবে। উহ উল্লেখ করিতে পারেন, কিন্তু তদ্দ্বারা অজ্ঞতা ঢাকিতে চেষ্টা করিবেন না। পাঠক ও শ্রোতা হাজার বিষয়ে অজ্ঞ হউন, তাহাঁরা মানুষ, বুদ্ধিশালী মানুষ, এ কথা কদাপি ভুলিবেন না।

আমাদের বৈজ্ঞানিক যুবকের নিকট কখনও কখনও দ্বিবিধ প্রশ্ন শুনিয়াছি; (১) গবেষণার কি বিষয় বাকি আছে যাহা তিনি আরম্ভ করিতে পারেন; (২) গবেষণার বিষয় থাকিতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান-কর্মশালা নইলে ত কিছুই করা যাইতে পারে না। প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রায় দিয়াছি; দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে বলি, বিজ্ঞান-শালায় পরীক্ষায় পূর্বে প্রথমে ভূয়োদর্শন চলুক। পরিসংখ্যান কিংবা ভূয়োদর্শনের নিমিত্ত বিজ্ঞান-শালার প্রয়োজন হয় না। উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া চলিতে থাকিলে বিধের আপনি জুটিবে। আমরা সংসার-বৃত্তিতে "বাবু" হইয়া পড়িয়াছি। আমার মনে হয় জ্ঞানের পথে চলিবার সময়ও ভোগাসক্তি ভুলিতে পারি না। আমরা আর্য্য-ঋষি-মহর্ষি ইত্যাদি নাম উচ্চারণ দ্বারা গর্ব অনুভব করি। কিন্তু যাহাঁদের জ্ঞানের জন্য আমাদের গর্ব তাহাঁরা কি টানা-পাখার বাতাসে বসিয়া ভোগ-বিলাসে থাকিয়া জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন? বিজ্ঞান-শালা নাই,

যন্ত্র-পাতি নাই; নাই থাক। এমন বিষয়ও ত আছে যাহাতে যন্ত্র-পাতি লাগে না। মানুষই বড়, যন্ত্র ত বড় নহে। এইত সে দিন ওড়িষ্যার চন্দ্রশেখর সিংহ দুই খণ্ড কাষ্ঠ লইয়া অসাধ্য-সাধন করিয়া গিয়াছেন। যে পঞ্জিকাসংস্কার-কোলাহলে কর্ণ পীড়িত হইয়াছে, দুই খানা কাঠির জোরে ওড়িষ্যায় সে কোলাহল উঠিতে দেন নাই।

তৃতীয় প্রশ্নও শুনিয়াছি। বিজ্ঞান-শালা আছে, অবসরও আছে। কিন্তু কোন্ বিষয়ে গবেষণা কতদূর হইয়াছে তাহা জানি না, ইয়ুরোপ ও আমেরিকার যাবতীয় বৈজ্ঞানিক পত্র দেখিতে পাই না, যাবতীয় ভাষাও বুঝি না। ইহাঁদিগকে আমার নিবেদন এই যে, দেশের বার্তা কিংবা কলা ধরিয়া গবেষণা করুন, তাহা নিশ্চয়ই নূতন এবং অফুরন্ত আছে। যে কোন একটা ধরুন সেটা শেষ হইতে না হইতে দশটা আক্রমণ করিবে। সেটার বিজ্ঞান অন্য কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকিলেও ক্ষতি হইবে না। দেশভেদে পাত্রভেদে ব্যাখ্যার ভেদ হইতে পারে, পূর্ব আবিষ্কার সত্য কি না পরীক্ষা হইবে। ইহাও না হয়; আপনার চেষ্টিত দ্বারা আপনার শক্তি বাড়িবে। আত্মশক্তি-লাভ শ্রেয়স্কর। হলাণ্ড-দেশীয় ডি-ভিরিজ্ নামক উদ্ভিদ্‌বেত্তা তাহাঁর বাগানের একটা গাছের পরিবৃত্তি দেখিয়া তাহার তত্ত্ব আবিষ্কারে নিযুক্ত, হইয়াছিলেন। পরে ডার্বিনের মতের অপবাদ ধরিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে জঙ্গম ও উদ্ভিদের জাতি-বহুলতা ঘটে নাই, অর্থাৎ জীবসৃষ্টি অবিচ্ছিন্ন ভাবে হয় নাই। তাহাঁর গবেষণার সময় তিনি পূর্ববর্ত্তী মেণ্ডেলের গবেষণার ফল কিছুই জানিতেন না। ডি-ভিরিজ বর্ণসঙ্করণ দ্বারা গুণহারিতা অনুসন্ধান করিতেছিলেন, মেণ্ডেলও সে বিষয়ে গবেষণা করিয়া এমন এক তথ্য পাইয়াছিলেন যাহা এখন মেণ্ডেলের সূত্র নামে প্রচারিত হইয়া বিবর্তনবাদীর মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ডি-ভিরিজ মেণ্ডেলের সূত্র অবগত থাকিলে হয়ত তাহাঁর গবেষণা পাইতাম না,

কিংবা তাঁহার চিন্ত-প্রসূত অনুমানও আসিত না। অতএব দেখা যাইতেছে, কে কোথায় কি তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা না জানিলেও গবেষণার ফল ব্যর্থ হয় না।

তবে এ কথা মানি, কাজের একটা শৃঙ্খলা থাকিলে ভাল হয়। সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালা গ্রন্থ অনুসন্ধান করিতেছেন, এই নিমিত্ত কর্মী নিযুক্ত করিয়াছেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে কি ফল ফলিয়াছে তাহা আমরা সবাই জানি! বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি কর্মীর দল বাঁধিতে পারিয়াছেন, এবং আমাদের দেশের ইতিহাস উদ্ধারে নিযুক্ত হইয়াছেন। দেশের বিজ্ঞানৈষণার এইরূপ এক সমিতি হইলে অনেক অকর্মা ও নিষ্কর্মা কর্মীর দলে পড়িয়া কর্মের পথ দেখিতে পাইতেন। মনে করুন যেন তাঁহারা সকলেই আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, আসুন আমরা দেশের বার্তার বিজ্ঞান উদ্ধার করি। এ কাজে ছোট-বড় ভেদ নাই, দেহের হাত ছোট কি পা ছোট; তাহা যেমন নিরর্থক প্রশ্ন, এ কাজের কাজীদিগের ছোট-বড় নাই। যিনি আবহ-বিদ্যা ভালবাসেন, তিনি কৃষি ও আবহের সম্বন্ধ স্থির করুন। কোন্ মেঘে কখন কি পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে, অমাবস্যায় পূর্ণিমায় বৃষ্টি হয় কি না, "চাঁদের শোভা নিকট জল" এ কথা সত্য কি না, বাতাসে ঝড়ে কোন্ শস্যের কি ক্ষতি হয়, ক্ষতি হয় কেন, আমের মুকুলের কোন্ অবস্থায় কুয়াসা হিতকর নহে, ইত্যাদির উত্তর সংগ্রহ করুন। যিনি কৈমিতিক গবেষণা ভালবাসেন, তিনি কৃষির পক্ষে মাটির তিন আবশ্যক উপাদানের হ্রাস-বৃদ্ধি পরিণাম করুন; শস্যের সহিত মাটির উপাদানের সম্বন্ধ নির্ণয় করুন, শস্যের পরিমাণ ও গুণের সহিত• করুন, কিংবা শস্য-বৃক্ষের বয়স অনুসারে করুন, ইত্যাদি। এইরূপ নানা বিষয় আছে। যিনি যে শাখা ভালবাসেন তিনি সেই শাখাতেই জ্ঞাতব্য বিষয় পাইবেন। ডাক্তার-কবিরাজ সকলেরই কাজ করিবার আছে। বিজ্ঞান ছাড়িয়া অর্থবিদ্যারও প্রচুর ক্ষেত্র আছে।

উপরে যে সমিতির উল্লেখ করিয়াছি, সে সমিতি প্রশ্ন ছাপাইয়া কোথাও কোথাও মার্গ-সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়া দেশের মধ্যে বিতরণ করিবেন। আমার বিশ্বাস, এইরূপে দেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। যাহার ফল সদ্য সদ্য পাই, তাহার দিকে আমরা স্বভাবতঃ ধাবিত হই। এই কারণে কৃষিবার্তা ধরিয়া বিজ্ঞান প্রচার করিতে বলিতেছি।

কিন্তু বিজ্ঞান-প্রচারের কথা উঠিলেই ইহার ভাষা-পরিভাষার প্রশ্ন উপস্থিত হয়। গত বৎসর রামেন্দ্র বাবু এ বিষয়ে বলিয়াছেন। আমার মনে হয় আমরা পরিভাষা-সমস্যা যত কঠিন মনে করি, বস্তুতঃ তত নহে। এ বিষয়ে দুই চারি কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

ব্যাকরণে শব্দের চারি প্রবৃত্তি বা অর্থ ধরিয়া শব্দসমূহ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। জাতি শব্দ, গুণ শব্দ, দ্রব্য বা সংজ্ঞা শব্দ, এবং ক্রিয়া শব্দ। এই চতুর্বিধ শব্দের মধ্যে দ্রব্য শব্দ সম্বন্ধে সঙ্কট মনে হইয়াছে। কথাটা এই, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন বলিব, না অন্য নামে বলিব? এরূপ বিতর্ক ওঠে কেন, তাহা বুঝা কঠিন। গোরুকে গোরু বলিব, না অন্য কিছু বলিব, এই বিতর্ক যেমন, অক্সিজেন-কে অক্সিজেন বলিব, না অম্লজান বলিব, সে বিতর্কও তেমন। নূতন দ্রব্য যাহার নিকট পাই, সে যে নাম বলে, সে নামেই তাহা পরিচিত হয়। সকল ভাষাতেই ইহা সাধারণ নিয়ম। সংস্কৃত-কোষে গ্রীক ও আরবী নাম পাইবেন; বাঙ্গালা-কোষে, ইংরেজী-কোষে নানা ভাষার শব্দ পাইবেন। কত ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালায় চলিতেছে স্মরণ করুন। সে সকল শব্দ কেবল দ্রব্য-বাচকও নহে। ইয়ুরোপে বিজ্ঞানের অভ্যুদয়; আমরা সে বিজ্ঞান ইংরেজীতে শিখিতেছি। শুধু বাঙ্গালী নহে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোক শিখিতেছে। সকল প্রদেশের সহিত মিলাইয়া ভারতবর্ষের নিমিত্ত সংজ্ঞা-শব্দ নির্ণয় করিতে পারিলে অন্ততঃ কিছু সুবিধা হইত। কোন্ প্রদেশে অক্সিজেনকে কি বলা হইতেছে তাহা জানা নাই। মনে রাখিতে

হইবে, ভারতবর্ষে কেবল সংস্কৃতমূলক ভাষা নহে, মুসলমানী ভাষা ও দ্রাবিড় ভাষা চলিত আছে। যদি বিভিন্ন প্রদেশে অক্সিজেনের বিভিন্ন নাম হয়, তাহা হইলে ইংরেজী এক নামের স্থানে পঁচিশ নাম আসিয়া জুটিবে। যদি অধিকাংশ প্রদেশে অক্সিজেন কিংবা ইহার কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত নাম চলে, তাহাতে আমাদের সকলের সুবিধা। প্রদেশভেদে নাম বিভিন্ন না হইলে মাতৃভাষা ছাড়িয়া ইংরেজী পড়িতে গেলে নূতন নাম শিখিতে হইবে না। ইয়ুরোপের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে বৈজ্ঞানিক নাম এক রহিয়াছে। যে নাম পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল, সে নাম আছে, বৈজ্ঞানিক নামও আছে। লোহা না বলিয়া সব স্থানে যে আয়রন কিংবা অয়স বলিতে হইবে, তাহা নহে। ছেলের ডাকনাম রাখার মতন দুই পাঁচটা ইংরেজী নামের বাঙ্গালা ডাকনাম রাখিলে ক্ষতি নাই। জাপানীরা বৈজ্ঞানিক নাম জাপানী ভাষায় অনুবাদ করে নাই, কাজ বেশ চলিতেছে। যখন আমরা কোন দ্রব্য আবিষ্কার করিব তখন বিশেষ কারণ না থাকিলে, আমাদের প্রদত্ত নাম ইয়ুরোপেও চলিবে।

একটা কথা এই, কোন কোন ইংরেজী নাম আমাদের মুখে সহজে উচ্চারিত হয় না, আমাদের কানে ভাল শোনায় না। বড় বড় শব্দ, সংস্কৃত শব্দ, ইংরেজী শব্দ, আরবী ফারসী শব্দ, বাঙ্গালাতে কিছু কিছু বিকৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু বিকারের সূত্র জানা আছে। সেই সূত্র ধরিয়া ইংরেজী নাম-শব্দের কিছু পরিবর্তন করিয়া লইলে বাঙ্গালা ভাষায় স্বচ্ছন্দে মিশিয়া যাইবে। যিনি ইংরেজীতে শিখিবেন, তাঁহাকে একেবারে নূতন নাম শিখিতে হইবে না, বাঙ্গালায় যাহা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে দেখিয়াছেন, তাহাই পূর্ণ আকারে পাইবেন। এমন কি, ইংরেজী নামের জেন্ অস্ অম্ প্রভৃতি কাটিয়া দিলে যৌগিক নাম রচনায় সুবিধা হয়। অক্‌সিজেন— অক্‌সি, সলফর—সল্‌ফ, পটাসিয়ম পটাসি করিলে ক্ষতি দেখি না। ইংরেজী নাম লইলে আপত্তি হয় সে নামটা একেবারে সঙ্কেত থাকিয়া যায়। কিন্তু,

আমরা কয়টা দ্রব্যের নামের ব্যুৎপত্তি স্মরণ করিয়া তাহার প্রয়োগ করি? রূপাকে কেন রূপা বলি, তাহা জানি না; গন্ধক নাম কেন দেওয়া হইয়াছিল তাহা অন্বেষণ না করিয়াও আমরা বাজার হইতে গন্ধক কিনিয়া আনি। দ্রব্যের গুণ লক্ষ্য করিয়া নাম রচিত হইলে মনে রাখার সুবিধা হয় বটে, কিন্তু অন্য অসুবিধা ঘটে। ইংরেজীতেও অনেকগুলা কৈমিতিক মূল পদার্থের নামের অর্থ নাই; নামকর্তার সখ বই আর কিছু নাই। গুণবাচক শব্দ, সংজ্ঞা করিতে সংস্কৃত ভাষা অদ্বিতীয় ছিল। প্রাণী ও উদ্ভিদের এমন সংস্কৃত নাম প্রায় নাই যদ্দ্বারা লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। এখন সংস্কৃতের কাল নহে, অপর এক ভাষারও নহে। মনে রাখার সুবিধা হইবে ভাবিয়া অক্সিজেন অম্লজান, হাইড্রোজেন উদ্‌জান, জলজান, ইত্যাদি না-বাঙ্গালা না-সংস্কৃত না-ইংরেজী এমন অদ্ভুত নাম রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল অক্সিজেন হাইড্রোজেন নহে, ইহাদের অসংখ্য যৌগিক দ্রব্যের নাম আছে। এই এক কারণে সংস্কৃত নাম-করণ ব্যর্থ হইবে। ভূ-বিজ্ঞানের অসংখ্য মণির নাম বাঙ্গালায় রচিত হইবে কি? গাছপালা জীবজন্তুর নাম কি হইবে? সর্বাপেক্ষা দুরূহ প্রশ্ন এই, দেশী ভাষা হাজার হাজার লেটিন নাম গলাধঃ করিতে পারিবে কি? লেটিন নামের সঙ্গে সঙ্গে কি এক একটা সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক নাম রচনা করিতে হইবে? প্রয়োজন অনুসারে দুই-ই আবশ্যক হইবে, দেশী গাছপালা পশুপক্ষার দেশী নাম, বাঙ্গালা নাম, না থাকিলে গড়িতে হইবে, কিন্তু সকল স্থলে নহে, কিংবা শ্রেণী-বিভাজনে নহে। ইংরেজীতেও ডাকনাম ও বৈজ্ঞানিক নাম আছে। উদ্দেশ্য ও অধিকারীভেদে কোথাও ডাকনাম কোথাও সংস্কৃত, কোথাও বৈজ্ঞানিক লেটিন নাম করিতে হইবে। এখানেও, বোধ হয়, দীর্ঘ লেটিন নামগুলা বাঙ্গালায় সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে। ইহাতে দোষ হইবে না, কারণ বাঙ্গালাতে লেটিন নামের অর্থ কিংবা ব্যাকরণ কিছুই জানা থাকিবে না। গণ-নাম ও জাতি-নাম যোগে আকাশের তারার ইংরেজী নাম

হয় নাই। তারার নামে সে রীতি চলিতে পারে না। বোধ হয়, নক্ষত্র নাম বাঙ্গালায় করিয়া তারার নাম প্রভা ধরিয়া এক দুই তিন অঙ্ক দ্বারা রচনা করিতে হইবে। সংজ্ঞা-শব্দ ব্যতীত গুণক্রিয়া অবশ্য বাঙ্গালায় বলিতে হইবে। কদাচিৎ ইংরেজী শব্দও লইতে হইবে। এ বিষয় বহুবার বহুস্থানে আলোচিত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, যদি সাহিত্য-পরিষৎ উপযুক্ত লেখক দ্বারা এক এক বিজ্ঞান বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণিক পুস্তক লেখাইয়া প্রচার করিতেন, তাহা হইলে এতদিন একটা পথ দেখা যাইত। লেখার গুণে দুরূহ বিষয় সুবোধ্য হয়। সংজ্ঞা বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু লেখার দোষ থাকিলে সংজ্ঞায় ভয় সঞ্চার করে।

এখন উপসংহার করি। আপনাদের নিকট পিষ্ট-পেষণ করিলাম, পেষণ শব্দে কর্ণপীড়াও জন্মাইলাম। গ্রামবাসীর নিকট গ্রামের সংবাদ ব্যতীত অন্য কিছু আশা করিলে আপনাদের ভূয়োদর্শিতায় দোষ স্পর্শিবে। সময়ে অসময়ে আমরা কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি। সব সময় বুঝিয়া করি না। এই হেতু কলার লক্ষণ, কলার সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ, বিজ্ঞান শব্দের অর্থ স্থিতি মার্গ মহিমা অনুবোধন করিয়াছি। দেখিয়াছি প্রাচীনে ও নবীনে বিজ্ঞানের মার্গ ও তর্ক-বিদ্যা এক। অতএব আধুনিক বিজ্ঞানে আমাদের অগ্রসর হইবার বিঘ্ন দেখা যাইতেছে না। তথাপি দেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। আমার অনুভব-সিদ্ধ প্রতিকার জ্ঞাপন করিয়াছি, বহুর নিমিত্ত মূর্ত-বিজ্ঞানের প্রয়োজন দেখাইয়াছি। শেষে কৃষিবার্তা উপলক্ষ্য করিয়া দেশের সকলকে, বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক, গ্রামবাসী ও পুরবাসী, সকলকে সম্বোধন করিয়াছি। মানব সমাজ যেমন হউক, তাহার আয়ুর্বেদ নিশ্চয় থাকে, বার্তাও থাকে। আমাদেরও ছিল ও আছে। চরক লিখিয়াছেন, বায়ু বিনা অগ্নি জ্বলে না, মেঘের সৃষ্টি হয় না, জলের বর্ষণ হয় না, পুষ্প ফলের উৎপাদন, উদ্ভিদের উদ্ভেদন, শস্যের বর্ধন, লৌহ পিত্তলাদি ধাতুর প্রভেদকরণ, প্রভৃতি

হয় না। এ সব কথা নিশ্চয়ই ভূয়োদর্শনের ফল, পরীক্ষার ফল। এইরূপ কৃষিবার্তায় কত বিজ্ঞান লুকায়িত আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনারও সময় নাই। আমরা কোন কোন বিষয়ে চারি শত, কোন কোন বিষয়ে দুই একশত বৎসর ইয়ুরোপের পশ্চাতে পড়িয়াছি। এখন আমাদিগকে দৌড়াইতে হইতেছে। তার উপর, পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান অল্প বয়সেই এত লাফাইতেছে এত দৌড়াইতেছে যে আমরা পেছু ধরিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমাদিগকে নাকি দ্বিবিধ পাপের ফল ভুগিতে হয়। কালকৃত পাপে আমরা বাধা দিতে পারি না, যদিও ফলভোগ করিতেই হয়। ইহার উপর, আলস্য ও প্রমাদ জনিত পাপ জুটিলে উদ্ধারের আশা থাকে না।

কিন্তু এক বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। সে কালের একঘ্ন অসির পরিবর্তে এই যে ইয়ুরোপে শতঘ্ন বাণ নির্মিত হইয়াছে, প্রকৃতির উপর আধিপত্যলাভে ইয়ুরোপ ও আমেরিকার ভোগ-প্রবৃত্তির আস্ফালনে দিগন্ত কম্পিত হইতেছে, তাহা হইতে বিরত হইতে হইবে। যে বিদ্যা বা বিজ্ঞান বিনয় না দেয়, যাহাতে "জ্ঞান" না জন্মায়, সে বিদ্যা বা বিজ্ঞান পয়োমুখ বিষকুম্ভ জানিতে হইবে। এদেশ চিরদিন মোক্ষাভিলাষী; এদেশ নির্বাণের দেশ, বৈষ্ণবের দেশ। এদেশে শক্তিও বৈষ্ণবী মূর্তিতে পূজিতা হন। নাস্তিক্যের প্ররোচনা বর্জন করিয়া শ্রেয়ের পথে চলিতে হইবে। আমাদের প্রাচীনেরা এ কথা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা বিজ্ঞান ও দর্শন এক করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন প্রকৃতির জ্ঞান বা বিজ্ঞান খণ্ড-জ্ঞান। সে জ্ঞান দ্বারা আমাদের সত্তা ও জীবনের লক্ষ্য বুঝিতে পারা যায় না। ইদানী দর্শন হইতে বিজ্ঞান পৃথক্ করা হইয়াছে। প্রকৃতির মন্দিরে প্রবেশ-পথে আধুনিক বিজ্ঞান নিম্ন সোপান হইয়াছে; দর্শন উচ্চে রহিয়াছে। কিন্তু উভয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনের, বিজ্ঞান ও ধর্মের কৃত্রিম কলহ সৃষ্টি হইয়াছে। আজিকালির অধিকাংশ বিজ্ঞান-সেবী

ধূলা-বালি লইয়া খেলা করিয়া জীবন কাটাইতেছেন। কদাচিৎ কেহ খেলা-ঘর ছাড়িয়া দূরদর্শী হন, প্রকৃতি-বিকৃতি ছাড়িয়া মূল-প্রকৃতি দর্শন করেন; ভাগ্যবান্ কেহবা ইঁহারও ঊর্ধ্বে প্রকৃতি পুরুষের যুগলমিলন প্রত্যক্ষ করেন। ইহাঁরা ধন্য, ইহাঁদের সাধনা ধন্য। বিজ্ঞানকে ধূলা-খেলা মনে করিলে, প্রকৃতির লীলা-নর্তনে আনন্দ পাইলেও তাহাতে বিমোহিত হইলে, আমাদের দেশের বিজ্ঞান ভুলিলে, বিজ্ঞান-চর্চা সার্থক হইবে না।

জন্ম ও মৃত্যু।

ঝম্-ঝম্ শব্দে বেশ বৃষ্টি হইয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল; রাত্রি ১০টা, এখনও বৃষ্টি সম্পূর্ণ থামে নাই। অনেক দিনের পর বৃষ্টি; পৃথিবী শীতল হইয়াছে। একাদশীর চাঁদ মেঘের আড়ে থাকিয়া সমুদয় গাছপালায় মাঝে মাঝে আলো মাখাইয়া দিতেছে। এমন নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ সময়ে শয্যায় শুইয়া ভেককুলের চীৎকার ভাল লাগে কি? কিন্তু দুঃখেরও বিরাম আছে। অল্পক্ষণ পরে চীৎকার আর শুনিতে পাইলাম না।

এইরূপে কতক্ষণ গিয়াছে, জানি না। দেখিলাম, শুধু ভেক নয়, সমুদয় প্রাণিজগৎ আমায় ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। এক দিকে সূক্ষ্ম "আমিবা" স্বীয় সান্দ্র দেহ ক্ষণে ক্ষণে বিস্তৃত ও আকুঞ্চিত করিয়া আর্দ্র ভূমিতে গুড়ি মারিয়া চলিয়া যাইতেছে। বিন্দু মাত্র জলে শত শত "ইনফুসোরিয়া" দেহের দ্রুত কেশ-সঞ্চালন দ্বারা ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। প্রবালপুঞ্জ সমুদ্র-নিমগ্ন দ্বীপে পুরুষানুক্রমে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। কঞ্চুলিকা, জলৌকা প্রভৃতি স্ব স্ব দীর্ঘ দেহ তরঙ্গায়িত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। শতপদী ও সহস্রপদী প্রস্তরের নিভৃত কোণ হইতে রেলের গাড়ীর মতন গুড়ি গুড়ি বাহির হইতেছে। দেখিলাম, পতঙ্গকুল জল-স্থল-বায়ু ছাইয়া ফেলিয়াছে; বুক-পেট-মাথা পৃথক্ বলিয়া তাহারা আপনাদিগকে কৃমি

অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করিতেছে। এ দিকে ইঞ্চাক কর্কট প্রভৃতি স্বীয় বর্মাবৃত দেহের অধোভাগে সহস্র সহস্র অণ্ড ধারণ করিয়া বক্রপদে ক্ষণে ক্ষণে গিয়া থামিয়া যাইতেছে। বৃশ্চিক ঊর্ণনাভ প্রভৃতি শনৈঃ শনৈঃ পদবিক্ষেপে একান্তমনে কীটধ্বংস প্রতীক্ষা করিতেছে। শম্বুক, শুক্তিকা প্রভৃতি নিজ নিজ প্রস্তরময় আবাসগৃহ হইতে স্থূলপদ বিস্তৃত করিয়া মন্থরগতিকেও লজ্জা দিতেছে।

অপেক্ষাকৃত পদস্থ প্রাণীর কথা কি বলিব? কোথাও সফরী রোহিত প্রভৃতি মৎস্যকুল জলমধ্যে দৌড়াইয়া যাইতেছে। কোথাও গোধিকা, সরট, কুম্ভীর মুখব্যাদান করিয়া আহার-চেষ্টায় নিযুক্ত আছে। কোথাও গৃধিনী শকুনি, কোথায়ও কাক, কোথাও বক, হংস, সারস প্রভৃতি বহুবিধ পক্ষী কলরব করিতেছে। কোথাও মৃগ মেষ মহিষ, কোথাও শশক ইন্দুর, কোথাও সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ জন্তু শৈলময় অরণ্য ঘোর গর্জনে সন্ত্রস্ত করিতেছে। শিশুক তিমি বিশাল দেহ দ্বারা জলরাশিকে দ্বিভাগ করিয়া অপসৃত হইতেছে। অজিনপত্রা ঊর্ধ্বপদ সন্ন্যাসীর ন্যায় তপোক্লেশের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। মর্কটাদি ফলান্বেষণে লম্ফে-ঝম্পে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ভগ্ন করিতেছে।

দেখিয়া একান্ত ভীত ও বিস্মিত হইলাম। এ কোন্ রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম, ভাবিয়া চিন্তাকুলিত হইলাম। এই সমস্ত প্রাণিপুঞ্জ কেন এত ছুটাছুটি করিতেছে, কি উদ্দেশ্যে এত উৎকণ্ঠার পরিচয় দিতেছে? সন্ধ্যার পূর্বে কলিকাতায় চৌরাস্তায় দাঁড়াইয়াছি, পুরীর জগন্নাথ-দেবের রথযাত্রায় জনস্রোত লক্ষ্য করিয়াছি, বর্ষাকালের মেঘপুঞ্জ বাতাসে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু এত ছুটাছুটি, এত কলহ, এত মারামারি, কোথাও দেখি নাই। ইহাদের মধ্যে আমি যেন নাই, ইহাদেরই অনুকম্পায় যেন আমি বাঁচিয়া আছি, এরূপ বোধ হইতে লাগিল।

এইরূপ ভয়-বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় দেখি, এক

ভেক-বধূ চামেলীর মূলে বসিয়া আমায় লক্ষ্য করিতেছে। ভেককুলকে কখনও ভাল চক্ষে দেখিতে পারি নাই। এই বিপদ-সঙ্কুল অবস্থায় ভেক-বধূকে দেখিয়া আমার ঘৃণা আরও বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু ভেক-বধূ বড় মুখরা, বলিতে লাগিল, "তুমিও যে উদ্দেশ্যে আপন অস্তিত্ব-রক্ষায় নিযুক্ত আছ, আমরাও সেই অভিপ্রায়ে কালযাপন করিতেছি। তুমি বা কত দিনের? কত কত প্রলয় হইয়া গিয়াছে, কত কত প্রাণিপুঞ্জ আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছে; কিন্তু সেই আদিম জীবস্রোত কখনও রুদ্ধ হইয়াছে কি? যে অলঙ্ঘ্য বিধানে তুমি আমাদের অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছ, পৃথিবীটা তোমার একার রাজ্য বলিয়া গর্বে স্ফীত হইতেছ, তাহা তোমারও নয়, আমাদেরও নয়। তুমি অসীম সাগরতরঙ্গের একটা জলকণা মাত্র। তরঙ্গের জলকণা ক্ষণে ক্ষণে স্থানচ্যুত হইতেছে, কিন্তু তরঙ্গের শেষ হইয়াছে কি? আমরা ও তোমরা সেই তরঙ্গের পাশাপাশি রহিয়াছি; তোমরা না হয় সেই তরঙ্গের শীর্ষে উঠিয়াছ, কিন্তু তা বলিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া তোমাদিগের অস্তিত্ব নাই।"

ভেক-বধূর মুখে দার্শনিকের যোগ্য তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইতে শুনিয়া আমি আরও বিরক্ত হইলাম। কিন্তু কথাগুলায় একটু বিস্ময় জন্মিল। ভেক-বধূ আমার মনের ভাব জানিতে পারিয়াছিল; বলিয়া উঠিল, "তুমি আমাদিগকে যত নিকৃষ্ট মনে করিতেছ, বস্তুতঃ আমরা কি তাই? আমাদের দেহ, আমাদের কর্ম-সামর্থ্য বিবেচনা করিলে আমাদের অপেক্ষা তোমাদিগকে অধিক উৎকৃষ্ট মনে করিতে পারিবে না। মানব নাম লইয়াছ বলিয়া, বুঝি, তোমরা আমাদের অন্তর্গত নও? মনে রেখো, কেবল তোমাদের জন্য কোন নূতন বিধান হয় নাই।"

এই কথা শুনিয়া আমি আরও রুষ্ট হইলাম। মানব যে উহাদের বাহিরে নয়, একথা প্রগল্‌ভা ব্যতীত অপর কেহ বলিতে পারে না। যাহা হউক,

কূপমণ্ডূকের সহিত তর্কে কে কবে জয়লাভ করিতে পরিয়াছে। এই ভাবিয়া একটু মৃদু হইয়া বলিলাম, "হে অনিন্দিতে, তুমি অত গর্বিতা হইও না। উচ্চ ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক-স্থাপনের প্রয়াসে নীচ ব্যক্তি উপহাসাস্পদ হয়। আমরা বড় কি তোমরা বড়, সে কথা অন্য সময়ে হবে। এমন নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ সময়ে তোমাদের কোলাহলে আমি প্রীত হই নাই। চপলতা ছাড়িয়া একটু শালীনতা অভ্যাস কর।"

আমার কথা শুনিয়া ভেক-বধূ কোপনা বামার ন্যায় মুখভঙ্গী করিয়া বলিতে লাগিল, "আমরা দীনহীন বটি, কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছি, নানাবিধ শত্রু হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতেছি। দেখিতেছি, তোমরাও আমাদের নূতন শত্রু হইতেছ।"

আমি প্রবোধ দিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম, "দেখ, তুমি বড় ভুল বুঝিয়াছ। আমি তোমাদের গোষ্ঠীকে পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে বলি নাই। আমাদেরই একজন তোমাদের চিরশত্রু ধ্বংস নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়াছিলেন। তোমরা যদি এত প্রজাবৃদ্ধি না করিতে, তাহা হইলে এত ক্লেশ পাইতে না।"

ভেকবধূ অবজ্ঞাসূচক স্বরে বলিতে লাগিল, "তোমাদের বকধার্মিকত্বের আর পরিচয় দিও না। তোমাদের আহার-অর্জনের নিমিত্ত, তোমাদের সেই ব্যক্তি নাগযজ্ঞ করিয়াছিলেন। তোমাদের সভ্যদেশে আমাদের 'আবাদ' আরম্ভ হইয়াছে। যে কয়েক প্রাণী তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, তাহাদিগকে লইয়াই সন্তুষ্ট হও না কেন? আমাদিগকেও তোমাদের ভক্ষ্য মধ্যে গণনা করিয়া আমাদের শত্রু-সংখ্যা আর বৃদ্ধি করিও না। আমাদের শোণিত উষ্ণ নহে বলিয়া তোমাদের জীব-বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীরা আমাদিগকে লইয়া খেলা করিতেছেন, আমাদের চৈতন্য লোপ করিয়া তাঁহারা নিজের জীবন-ক্রিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। দেখিতেছি, তোমরা আমাদের সভ্যশত্রু হইয়াছ।" এই বলিয়া ভেকবালা রোদন করিতে লাগিল।

তাহার রোদনে আমি একটু দুঃখিত হইয়া বলিলাম, "জীবন-সঙ্কটে সকলের হিতাহিত বিবেচনা থাকে না। তোমরা যদি গৃহপালিত অবস্থায় অপত্য উৎপাদন না করিতে, তোমাদের এই নূতন বিপদ ঘটিত না।" ভেকবধূ উত্তর করিল, "হেয় গ্রাম্য প্রাণীরাই ত পথ দেখাইয়া দিয়াছে, দাস্য অবস্থায় সন্তান প্রসব করিয়াই ত তোমাদের লোভ বাড়াইয়া দিয়াছে। তাহারা আপন আপন গৌরব বিস্মৃত হইয়া পোষকের ক্রীড়া-পুত্তলী হইয়াছে। তাহারা সঙ্কর উৎপত্তি করিয়া তোমাদের আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া দিয়াছে। তাহাদের জীবনকে ধিক্!" এই বলিয়া ভেকবধূ বিষণ্ণচিত্তে চামেলীকে বলিতে লাগিল, "তোমাদের যে দশা হইয়াছে, অচিরে আমাদেরও সেই দশা আশঙ্কা করিতেছি। বিধাতা আমাদিগকে ক্ষীণজীবী করিয়াছেন; কিন্তু প্রজা-সৃষ্টি-বিধান যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী উদ্ভূত হইয়া মানুষের দর্প নিশ্চিত খর্ব করিবে।"

ভেক-রমণীর কথাগুলা আমার নিকট অভিশাপ বলিয়া বোধ হইল। মনে মনে আতঙ্ক হইল। ভাবিলাম, বিধাতা কি ক্রমবিকাশবিধি আরও প্রসারিত করিবেন? আমাদিগকে চরমসৃষ্টি ভাবিয়া তিনি কি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই? যদি তাঁহার এরূপ সংকল্প থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ-কালের ভয়ঙ্কর জীবন-সংগ্রামে আমরা কিরূপে রক্ষা পাইব? আমায় বিষণ্ণ দেখিয়া ভেক-বধূর কারুণ্য জাগিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতে আমার আরও ক্লেশ হইতে লাগিল। মানুষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রাণীর কল্পনা করিতেও গা শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। না জানি তাহাদের মতিগতি কি হইবে, না জানি তাহারা আমাদিগকে কি চক্ষে দেখিবে!

সুযোগ বুঝিয়া ভেকবধূ বলিতে লাগিল, "দেখিতেছ না, অল্প সময়ের মধ্যে তোমাদের অরণ্যবাসী অসভ্য হইতে নাগরিক সভ্যগণের কত প্রভেদ ঘটিয়াছে? অল্পে অল্পে ভবিষ্যৎ মানবের সহিত তোমাদের আরও বিভেদ

ঘটিবে। তোমাদিগকে তখন শতপুত্রের জনক-জননী হইয়া কিম্বা নীচ কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে।"

কথাগুলা আমায় আদৌ ভাল লাগিল না। ভেকবধূকে বিষয়ান্তরে আনিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "অয়ি সুকণ্ঠে, দূর ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহার চিন্তায় এখন ফল কি? তখন তুমিও থাকিবে না, আমিও থাকিব না! সুতরাং তৃণাচ্ছাদিত ব্যাঘ্রের ন্যায় অস্পষ্ট প্রতীয়মান ভবিষ্যতের ভাবনার প্রয়োজন কি? আকাশ পরিষ্কৃত হইয়াছে, কবে ধারাসম্পাতে তোমার বসন্ত আবার উপস্থিত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই।"

ভেক যুবতী ঈষৎ লজ্জানত মুখে উত্তর করিল, "যদি আমার দেহত্যাগে আমি ইহধাম ত্যাগ করিতাম, তাহা হইলে তোমার স্বার্থপর প্ররোচনায় ভুলিয়া যাইতাম। যদি আমার পুত্রেরা জীবিত থাকে, তাহা হইলে যে আমিই জীবিত থাকিব! অমরত্বলাভের নিমিত্ত তোমাদের কত লোক কত-না তপঃ-ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব দেহ অমর করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। আমরা বিধাতার বিধান গ্রহণ করিয়া থাকি। সেই জন্য এত ছুটাছুটি, এত কোলাহল করিয়া থাকি। একবার আমাদের রাজ্য বেড়াইয়া আইস, তোমার দিব্যজ্ঞান হইবে।"

ভেকবালার কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। ভাবিলাম, আত্মাকেই অমর বলিয়া শুনিয়াছি। আমাদের দেহখানাও কি অমর? তাহা হইলে জন্ম ও মৃত্যু, শব্দ দুইটার অর্থ কি? উত্তরটা ভেকবালাকে জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জাবোধ হইল। এজন্য প্রৌঢ়া চামেলীকে লইয়া প্রাণিরাজ্যে বেড়াইতে বাহির হইলাম! চামেলীকে সঙ্গে লইবার অপর অভিপ্রায় ছিল। তাহারাও অমর কি না, জানিবার ইচ্ছা হইল।

দেখিলাম, জীবনকালের আদি ও অন্তের নাম, জন্ম ও মৃত্যু। ভাবিলাম, যদি জীবনটা কি, বুঝিতে পারি, তাহা হইলে তাহার আরম্ভ ও শেষও বুঝিতে

পারিব। এই হেতু জীবনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া জন্ম মৃত্যু বুঝিতে গেলাম, কিন্তু পারিলাম না। যেমন শক্তি, জড় প্রভৃতি মূল বিষয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করা অসম্ভব, তেমনই জীবন-রূপ ব্যাপারকেও কয়েকটা বাঁধাবাঁধি শব্দে বুঝিতে পারা অসম্ভব। জীবনের কয়েকটা সংজ্ঞা দেখিয়া আমাদের জ্ঞানের পরিধির ক্ষুদ্রত্ব বুঝিতে পাইলাম। কেহ বলিয়াছেন, যে সকল ক্রিয়া দ্বারা মৃত্যু নিবারিত হয়, তাহাই জীবন; কেহ বলিয়াছেন, সর্বদেহের অভ্যন্তরে নিরন্তর যে সকল সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ, যোগ ও বিয়োগ চলে, তাহারই সমষ্টির নাম জীবন। কিন্তু এইরূপ যে সকল সংজ্ঞা-নির্দেশের চেষ্টা হইয়াছে, তৎসমুদয় দ্বারা ঠিক বস্তু-নির্ণয় ঘটে না। যে কোন সংজ্ঞাই হউক, তাহাতে দেহ-শব্দ যোগ না করিলে উত্তরটা জটিল হইয়া পড়ে। অন্য দিকে, দেহ-শব্দ যোগ করিলে সংজ্ঞায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। তবেই, যাহার আদি ও অন্তের কথা বুঝিতে যাইতেছি, সেটাই বুদ্ধির অগম্য। কোন বস্তুর সংজ্ঞা নির্দেশ করা বাল্যকালে যত সহজ মনে হইত, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা ততই দুরূহ বলিয়া বোধ হইতেছে। জ্ঞান অসীম না হইলে, জ্ঞেয়বস্তু সম্বন্ধে সমুদয় ব্যাপার জ্ঞাত না হইলে, সংজ্ঞাটি সম্পূর্ণ হইতে পারে না। নড়ন চড়ন দেখিয়া জীবিত কি মৃত, অনুমান অত্যন্ত স্থূলদর্শীর যোগ্য।

জীবনের সংজ্ঞা দিতে না পারিলেও, তাহা যে কি, তাহা সকলেই কতকটা জানি। জীবের (প্রাণী ও উদ্ভিদ) জন্ম, বৃদ্ধি, পুষ্টি, অপত্যোৎপত্তি ও মৃত্যু আছে। যে জীবই হউক, তাহা প্রথমে অতীব ক্ষুদ্র থাকে; এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ-রূপ প্রখর দৃষ্টি ব্যতীত চর্মচক্ষুর অগোচর। বাহিরের বস্তু নিজসাৎ করিয়া একদিকে যেমন তাহা আকারে বড় হইতে থাকে, তেমনই তাহার ভিতরে ভিতরে নানাবিধ পরিবর্তন হইতে থাকে। সদ্যঃ-প্রসূত কুক্কুরশিশু অপেক্ষা মানবশিশু আকারে বৃহৎ কিন্তু অপূর্ণ। শরীর পরিপূর্ণ হইলে যৌবন বলি; এই সময় সন্তান জন্মে। যৌবনের পর আর বৃদ্ধি

কিংবা পুষ্টি হয় না। তখন জরা আরম্ভ হইয়া কিছুকাল পরে দেহত্যাগ ঘটে। এইরূপে প্রত্যেক জীবে কয়েকটি ক্রিয়া চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছে।

কিন্তু জীবন-ক্রিয়াকে এইরূপে বুঝিতে গিয়াও জন্মমৃত্যু বুঝিতে পারিলাম না। এক একটা স্বতন্ত্র দেহকেই আমরা জীব বলিয়া জ্ঞান করি। এজন্য জীবের দেহ-রচনা বুঝিলে যদি বা জন্ম-মৃত্যু বুঝিতে পারি, এই আশায় ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম 'আমিবা', 'ইনফুসোরিয়া' প্রভৃতি কয়েকটি প্রাণীর দেহ এক-একটি ক-ল। কতকগুলি প্রাণীর দেহে কল-সংখ্যা অধিক; কতকগুলির এত অধিক যে, দেহ বৃহৎ দেখায়। এই কলগুলি যেন এক একখানা ইট, আর দেহগুলা যেন এক একটা গৃহ। কোন গৃহে কোটি কোটি ইট লাগিয়াছে, এ গুলি বৃহৎ; কোন গৃহে অল্প লাগিয়াছে, এ গুলি ক্ষুদ্র; এমন গৃহও আছে, যাহাতে একখানির অধিক ইট নাই। শেষোক্ত এক-কল-নির্মিত জীব আকারে প্রায় ক্ষুদ্র। কিন্তু তিমি ও হস্তীর ন্যায় বিশাল-দেহ প্রাণীই হউক, কিম্বা 'আমিবা'র ন্যায় আণুবীক্ষণিক হউক, কেবল আকারের পরিমাণে ভিন্ন, রচনায় ভিন্ন নহে। যেমন বৃহৎ অট্টালিকায় কোটি কোটি ইট লাগিলেও তাহা ইষ্টকপুঞ্জ মাত্র, তেমনই বিশাল-দেহ প্রাণীগণের শরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল-সমষ্টি মাত্র। তবেই, 'আমিবা'র মতন ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহ পুঞ্জীকৃত হইলে বৃহৎ দেখাইতে পারিত। ইটের মধ্যে ছোট ও বড় প্রভেদ আছে সত্য, কিন্তু সে প্রভেদ অকিঞ্চিৎকর। ইটের কোন কোনটাতে বালুকা কিম্বা মৃত্তিকার ভাগ অধিক থাকে সত্য, কিন্তু বালুকা ও মৃত্তিকা ব্যতীত ইটের অন্য উপাদান নাই। ইটের কোন-কোনটা কঠিন, কোন-কোনটা মৃদু; কোন-কোনটা এত মৃদু যে, তরল কর্দমের মতন দেখায়। বস্তুতঃ নানাজাতীয় জীবের দেহ রচনা দেখিয়া ক্ষেত্রতত্ত্বের কথা মনে হইল। এক-কল-নির্মিত জীব-সমূহ যেন এক একটা বিন্দু; কোন-কোন জীবে সেই সকল বিন্দু একত্র হইয়া দীর্ঘ-রেখার আকার ধারণ

করিয়াছে; কোনটায় বিন্দুগুলি দুই দিকে বিস্তৃত হইয়া ক্ষেত্র হইয়াছে; কোনটায় তিন দিকে বিস্তৃত হইয়া ঘন আকার পাইয়াছে। প্রাণিরাজ্যে বিন্দু হইতেই একেবারে ঘন আকার দেখা যায়, উদ্ভিদরাজ্যে চতুর্বিধ আকারই বর্তমান। তবেই. কি স্থূল উপাদানে. কি দেহরচনায় প্রাণিগণের মধ্যে সবিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাইলাম না।

দেখিলাম, জীবনের যাবতীয় ক্রিয়াকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। কতকগুলি দ্বারা দেহ রক্ষিত হয়, অপরগুলি দ্বারা বংশ রক্ষিত হয়। প্রথমোক্ত ব্যাপারকে জীবনযাত্রা এবং দ্বিতীয়োক্ত ব্যাপারকে জননযাত্রা বলিতে পারা যায়। তবেই, যে প্রাণীই হউক, জীবন ও জনন, এই দুই প্রকার ব্যাপারেই তাহার জীবন অতিবাহিত হয়। জীবনেরও উদ্দেশ্য বিচার করিলে একমাত্র জননই অবশিষ্ট থাকে। বস্তুতঃ বংশরক্ষা ব্যতীত জীবের জীবনের কোন উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার আহার-বিহার, স্থিতি-গতি, যাবতীয় ব্যাপার প্রজা-সৃষ্টি অক্ষুণ্ণ রাখিবার দিকে চলিয়াছে।

কর্ম-ভেদে জাতি-ভেদের উৎপত্তি, এ একটা পুরাতন কথা। নরসমাজে সভ্যতার গতি কর্ম-ভেদের দিকে চলিয়াছে। সকল লোক সকল কর্ম সুচারু সম্পন্ন করিতে পারে না। উপযুক্ত পাত্রে কাজের ভার যতই পড়ে, কাজও তত ভাল হয়। সমাজ-বিজ্ঞানে কর্ম-ভেদের যেমন প্রয়োজন, জীবন-বিজ্ঞানেও তাই। 'আমিবা'কে তাহার সর্বাঙ্গে সকল কাজ করিতে হয়। তাহার পৃথক্ হাত পা নাই, মুখ নাই, কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই। ইহারা প্রাণিরাজ্যে অসভ্য প্রজা। তদপেক্ষা যাহারা সভ্য, তাহাদের দেহের কিয়দংশ শরীরের পূর্ণতা, পুষ্টি ও রক্ষার কর্মে নিযুক্ত; অপর কিয়দংশ বংশ-রক্ষার নিমিত্ত নির্দিষ্ট আছে। প্রথমোক্ত ক্রিয়াগুলির সম্পাদন জন্য দেহের অংশ-বিশেষ রূপান্তরিত হয়, শেষোক্ত ক্রিয়ার জন্যও অন্য অংশ

তদনুরূপ পরিবর্তিত হয়। এইরূপে প্রথমে হরগৌরী-মূর্তির উৎপত্তি। একই প্রাণীর কিয়দংশ পুং, কিয়দংশ স্ত্রী। প্রাণিগণের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ, তাহাদের কোনটা বা পুং, এবং কোনটা বা স্ত্রীরূপে পৃথক্ হইয়াছে।

দেখিলাম, 'আমিবা', 'ইন্‌ফুসোরিয়া' প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী স্বীয় দেহরূপ কলখানিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া স্বয়ং দুইটি কন্যাতে বিভক্ত হয়। কন্যাদ্বয় আহার দ্বারা পরিপুষ্ট হইলে আবার দ্বিখণ্ডিত হয়। এইরূপে কন্যা-প্রকন্যাদিরূপে প্রথম 'আমিবা' বর্তমান থাকে। প্রবালাদি কতকগুলি প্রাণীর দেহে স্ফোটক-সদৃশ কলিকা বহির্গত হয়। এই কলিকা-গুলি কখনও পৃথক্ হয়, কখনও বা পুরুষ-পরম্পরা বহুকাল একত্র বাস করে। এইরূপে তাহাদের উপনিবেশের উৎপত্তি। জলৌকা শুক্তিকাদি কতকগুলি প্রাণী এক একটা হরগৌরীরূপ; তাহাদের প্রত্যেকে স্ত্রী-পুং উভয়ই আছে। অপর প্রাণীর স্ত্রী ও পুং পৃথক্ হইয়াছে সত্য, কিন্তু পূর্বতন হরগৌরী-রূপের চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই।

স্ত্রী-পুংসে বিভক্ত প্রাণিগণের মাতা পিতার আকার প্রায়ই এত ভিন্ন যে, দেখিলেই তাহাদের কোন্‌টি স্ত্রী কোন্‌টি পুরুষ তাহা চিনিতে পারা যায়। কিন্তু এমন কতকগুলি প্রাণী আছে যে, তাহাদের স্ত্রী পুরুষ, ভেদ করিতে পারা যায় না। অথচ দুইটি প্রাণীর সংযোগ ব্যতীত সন্তান জাত হয় না। এস্থলে দুইটি কল মিলিয়া উভয়ে একটি সন্তানরূপে প্রকাশিত হয়। স্ত্রী-পুরুষ ভেদ করিতে পারা যায় না বলিয়া উহাদিগকে একই মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা প্রভেদ না থাকিলে সন্তান-প্রসবের জন্য দুইটি আবশ্যক হইবে কেন? তবেই জীবজগতে (প্রাণী ও উদ্ভিদ) বংশরক্ষার ত্রিবিধ ব্যবস্থা দেখা গেল।

প্রাণিরাজ্যে জনন-ব্যাপার বিস্তর দেখিবার ছিল। একটা জোনাকী-স্ত্রী জলসিক্ত বাবলা গাছ হইতে লণ্ঠন লইয়া তাহার স্বামীকে ঘরে আলো দেখাইয়া

আনিতেছিল। কয়েকটা পতঙ্গিনী কাঠ-ঠকৃঠকী সন্ন্যাসীর ন্যায় দেহের কয়েকখান কাঠের ঠক্-ঠকিতে, অপর কয়েকটা ঝিঁ-ঝিঁ শব্দে দিগন্ত প্রতি-ধ্বনিত করিয়া বিরহ-বেদনা জানাইতেছিল, কয়েকটা পতঙ্গ কন্যা-হরণ করিয়া পথিমধ্যে বিবাহ করিল। এক ভেকযুবক ভেক-কন্যার চীৎকার সুমধুর সঙ্গীত অনুভব করিয়া ভেক-কন্যার সমীপস্থ হইয়াছিল। পিকবর সহস্রাক্ষ পক্ষ বিস্তার করিয়া বধূর নিকট প্রণয় ভিক্ষা করিতেছিল। মৎস্য ব্যাঘ্র প্রভৃতি কতকগুলি স্বয়ম্বরারূঢ়া কন্যার পাণিগ্রহণ নিমিত্ত পরস্পর ভীষণ রণে ব্যাপৃত ছিল। নানা প্রাণী এইরূপ নানাবিধ ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল। সমুদয় দেখিবার অবসর হইল না।

পুং-স্ত্রী-বিভক্ত কোন কোন প্রাণীর মধ্যে এক অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার লক্ষিত হইল। পুরুষ ব্যতীতও তাহাদের স্ত্রীগণের সন্তান জন্মিয়া থাকে। মধু-মক্ষিকা পিপীলিকা প্রভৃতি কয়েকটি প্রাণী কর্ম-ভেদে তিন প্রকার। এক এক মধুমক্ষিকা-সমাজে ২০ ৩০ হাজার মক্ষিকা বাস করে। তাহাদের মধ্যে ১টী স্ত্রী, ২।৩ শত পুরুষ, এবং অবশিষ্ট ক্লীব। সেই স্ত্রী মক্ষিকাকে অনেকে রাণী বলিয়া থাকেন। যাহার বিশ ত্রিশ হাজার দাস, সে রাণী বই কি। যাহারা তাহার প্রণয়-পাত্র, তাহারাও যে নরসমাজের ব্যক্তি-বিশেষের ন্যায় কেবল বিহার-নিমিত্ত জীবন ধারণ করিবে, তাহাতেই বা আশ্চর্য কি? কিন্তু মক্ষিকা-সমাজে তাহারা না থাকিলেও প্রজা-বৃদ্ধির বিঘ্ন ঘটে না। বিবাহের পূর্বে রাণীর যে সকল ডিম্ব হয়, তাহারাই পরিপুষ্ট হইয়া সমাজের পুরুষ হয়; এবং যে সকল বিবাহের পরে জাত হয়, তাহারাই রাণী ও দাস হয়। যে সকল ডিম্ব হইতে মক্ষিকা-সমাজ রাণী পাইবার অভিলাষ করে, তাহাদের গৃহ ও খাদ্য উৎকৃষ্ট করে। রাজভোগ পাইয়া রাণীর জন্ম হয়। আর যাহারা কায়ক্লেশে অনাদরে শৈশবে লালিত-পালিত হয়, তাহাদের ভাগ্যে দাসত্বই ঘটে। যাহা হউক, দেখিলাম, এখানে বিবাহ না হইলেও কন্যার

অপত্যোৎপাদন হইতে পারে। চামেলীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহাদের রাজ্যেও জনকহীন পুত্রের দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

কিন্তু বিবাহই যদি জীবনের শেষ উদ্দেশ্য হয়, তবে ক্লীবত্ব কেন? দেখিলাম, যেমন এক প্রাণিদেহের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কার্যের নিমিত্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে, তেমনই এক জাতির কতকগুলি প্রাণী বংশরক্ষায় নিযুক্ত, অপরগুলি ভবিষ্য বংশীয়ের ভরণপোষণ নিমিত্ত সচেষ্ট থাকে। তবেই এ বিষয়ে তাহারা মানব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ক্লীবেরা সমাজের কেবল হিত সাধন নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে। সন্ন্যাসীর ন্যায় তাহাদের নিজের সন্তান থাকে না, অপরের সন্তানকে নিজের সন্তান জ্ঞান করিয়া তাহারা লালন পালন করিয়া থাকে। উন্নতির ক্রমই এই। যেমন কর্মের বিভাগ দ্বারা জীবন-যাত্রার উন্নতি হয়, তেমনই সমাজরূপ দেহের জীবন-যাত্রা ও জনন-যাত্রা-রূপ বিভাগ দ্বারা প্রধান দুই কর্মের উন্নতির পথ মুক্ত হইয়াছে। শুনিয়াছি নাকি কোন কোন সভ্য নরসমাজে বিবাহ তত প্রশস্ত নহে। ইহাদের বংশধরেরা ভবিষ্যতে ক্লীবদাসে পরিণত হইবে কিনা, বলিতে পারি না।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, মাতাই পালন করিয়া থাকে। কিন্তু পারাবতাদি কোন কোন প্রাণীর পিতা লালনপালনের ভার লইয়া থাকে। কোথাও বা মাতা-পিতা এত নির্মম যে সন্তানকে পরের ঘরে রাখিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত হয়। বসন্তের প্রিয়সহচর পরপুষ্ট পিকের এ কলঙ্ক চিরপ্রসিদ্ধ। সে নিজের সন্তানকে যেমন পর জ্ঞান করে, সন্তানও তেমনই পালক মাতাপিতার সন্তানগুলিকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয়।

নররাজ্যে নবাবী চালে অনেকে চলেন। ভৃত্যে খাওয়াইয়া পরাইয়া না দিলে তাহাঁদের একদণ্ড চলে না। এক জাতীয় লাল পিপীলিকাও ভৃত্য ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারে না। ভাণ্ডারে প্রচুর খাদ্য থাকিলে কি হয়, ভৃত্য নইলে খাবার মুখে ধরে কে? ভৃত্য নইলে সন্তান পালন করে

কে ? বাস্তবিক, দাস নইলে ইহাদের জীবন-ধারণ অসম্ভব। কাজেই দাসপুত্রকে শৈশবাবস্থা হইতেই ঘরে পুষিতে হয়।

সাংসারিক ব্যাপারে পুরুষকে যত পরিশ্রম করিতে হয়, নারীকে তত হয় না। নারী সন্তান প্রসব, সন্তানের লালন-পালন প্রভৃতি বংশরক্ষা-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজে বহু পরিশ্রম করে সত্য, কিন্তু বিবাহে সে উদ্‌যোগী হয় না। তাহার দেহ ও প্রকৃতি অলস ; সে রক্ষণশীল। কিন্তু পুরুষকে বিবাহের সময় উদ্‌যোগী হইতে হয়, নারীর অনুসন্ধান ও স্থলবিশেষে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। কাজেই প্রাণিরাজ্যে পুরুষ যত বলবান, ক্ষিপ্রকারী, ও ভ্রমণশীল, নারী তত নহে। অনেক পতঙ্গের কেবল পুরুষদিগের ভাগ্যে পক্ষলাভ ঘটে, মেয়েরা ঘরকন্না করে, নড়িতে-চড়িতে বড় একটা চায় না।

আর এক বিচিত্র ব্যাপার দৃষ্ট হইল। কতকগুলি প্রাণীর পুরুষ-পরিবর্ত ঘটে। মনে কর, ক পুরুষে স্ত্রী-পুং দুইই আছে। কিন্তু উহাদের বিবাহে যে খ পুরুষের জন্ম হইল, তাহাতে স্ত্রী-পুংস্ত্ব কিছুই নাই। ইহাদিগকে ক্লীব বলিবার যো নাই ; কেননা ক্লীবদিগের স্ত্রী-পুংস্ত্বের চিহ্ন বর্তমান থাকে। কিন্তু অ-স্ত্রীপুং খ পুরুষ হইতে আবার স্ত্রীপুং ক পুরুষের জন্ম হয়। এইরূপ ক-খ-ক-খ ইত্যাদি ক্রমে ইহাদের পুরুষ-পরিবর্ত ঘটে। চামেলীও বলিল, তাহাদের এক বৃহৎ রাজ্যে এই প্রকার পুরুষ-পরিবর্ত স্পষ্ট।

এই প্রকার কত অভাবনীয় ব্যাপার দেখিতে দেখিতে অনেক দূর গিয়া পড়িলাম। প্রত্যাবর্তন কালে চামেলী বলিতে লাগিল, "প্রজাসৃষ্টির যে তিন প্রকরণ দেখিলে, তাহাতে তুমি আমি সকলে অমর নই কি ? যাহারা দ্বিখণ্ডিত হইয়া কন্যারূপ ধারণ করে, তাহাদের মৃত্যু কোথায় ? যতদিন কন্যা-প্রকন্যাদি জীবিত থাকে, ততদিন তাহারা অমর। তাহাদের অপমৃত্যু ঘটে সত্য, কিন্তু অপমৃত্যু সামান্য বিধির ব্যভিচার মাত্র। অপমৃত্যু না ঘটিলে তাহাদের মৃত্যু হইত না। যাহারা কলিকা প্রসব করিয়া বংশরক্ষা করে,

তাহাদের সম্বন্ধেও এই কথা। একটী প্রাণী দুই অসমান ভাগে বিভক্ত হইলেই ক্ষুদ্রটিকে কলিকা বলা যায়। তৃতীয় প্রকরণে দেখিয়াছ, দুইটি বিভিন্নাকার প্রাণীর সংযোগে সন্তান জন্মে। কিন্তু এরূপ সংযোগ যে অত্যাবশ্যক, তাহা বলিতে পার না, কেননা কুমারীরও সন্তান জন্মিতে পারে।”

স্ত্রী-পুরুষের যোগে সন্তান জন্মে। এটা অতি স্থূল কথা। স্ত্রী ও পুরুষের যাহাতে স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব, তাহা যুক্ত হয়, এটাও স্থূল। হিন্দু শাস্ত্রকার স্ত্রীকে ক্ষেত্র এবং পুরুষকে বীজের সঙ্গে তুলনা করিয়া ঠিকই করিয়াছেন। ক্ষেত্র নইলে বীজ পুষ্ট হয় না, বীজ নইলে ক্ষেত্র নিষ্ফল। কিন্তু ক্ষেত্র নূতন নহে। বীজও নূতন নহে। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে স্ত্রী-কল হইতেই সন্তানের জন্ম, সেইটিই বীজ; পুংকল তাহাকে শক্তিমান্ করে।

দেখিলাম, আমরা ক্ষুদ্র অর্থ লইয়া সর্বদা বিড়ম্বিত হই। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই যে তাহার জন্ম হয়, এমন নহে। তাহার পূর্বে সে মাতৃ-দেহে ও পিতৃ-দেহে বিদ্যমান ছিল। যাহা ছিল, অব্যক্ত ছিল, উভয়ের সংযোগে তাহাই ব্যক্তীভূত হয়। বৃক্ষের বীজে যেমন সমুদয় বৃক্ষ সূক্ষ্মভাবে থাকে, জনক-জননীর বীজেও জনক-জননী তেমনই থাকে। এই হেতু বটবীজ হইতে বটবৃক্ষের উৎপত্তি হয়, ধান্যের হয় না, গো হইতে মানুষের হয় না। ক্ষেত্র ও বীজের সূক্ষ্মাংশ মিলিত হইয়া ক্রমশঃ ভ্রূণের আকার-প্রকার গ্রহণ করিয়া জননীর দেহ হইতে বিচ্যুত হয়। কোথাও বা ভ্রূণের আকার পাইবার পূর্বেই মাতৃদেহ হইতে অণ্ডরূপে নির্গত হয়। দেহের বাহিরে সেই অণ্ডের অন্তর্গত জীব ভ্রূণের আকার গ্রহণ করে। যেমনই হউক, সর্বত্র একই ক্রিয়া লক্ষিত হয়।

তবেই আমার সন্তানে আমিই জীবিত থাকি। ‘আত্মজ’ ও ‘জায়া’ শব্দেও তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে। সন্তান ও বংশ শব্দেও বৃদ্ধি বুঝায়। যদি বৃক্ষের শাখা হইতে বৃক্ষ হয়, এই শাখা হইতে জাত বৃক্ষকে নূতন বলিব

কেন ? যদি বল, যে সময়ে ক্ষেত্র ও বীজের সমাগমে নূতন শক্তি আবির্ভূত হয় ; সেই সময়েই জন্ম । কেননা মাতৃদেহে ক্ষেত্রের সত্ত্বা থাকিলেও স্বাতন্ত্র্য থাকে না ; বীজের সংযোগেই উভয়ে মিলিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে জীবন-চক্র পরিবর্তনে সমর্থ হয় । ইহারও উত্তর পূর্বে পাওয়া গিয়াছে । অবিবাহিতা কুমারীর গর্ভধারণে উপরি উক্ত তর্কের খণ্ডন হইতেছে। অতএব এই অর্থ সর্বত্র গ্রহণ করিলে, কোন প্রাণীর আদৌ জন্ম হয় না বলিতে হইবে। এই অর্থে জীবের জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই।

অর্থাৎ যদি বংশ থাকে, তাহা হইলে মৃত্যু কোথায় ? আমার আমিত্ব চলিয়া যায় কি না, তাহা এখানে বিচার্য্য নহে। সর্বদেহ বিকৃত না হইলে মৃত্যু বলিতে পারা যায় না। কিন্তু যখন দেহের ক্ষুদ্রাংশ, সর্ব অবয়বের সূক্ষ্মাংশ জীবিত থাকে, তখন তাহার মৃত্যু কোথায় ? সূক্ষ্মাংশ বলিয়া যদি আপত্তি কর, তাহাতেও মূল কথার অন্যথা হয় না। কেননা সর্বদেহ সতত এক থাকে কই। দেহ হইতে অণুর পর অণু নিরন্তর বিচ্যুত হইয়া পঞ্চভূতে মিশিতেছে, ভৌতিক জগৎ হইতে অণুর পর অণু দেহে যুক্ত হইতেছে। বস্তুতঃ দেহখানিকে সাগরের তরঙ্গ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তরঙ্গের রূপ আছে, কিন্তু যে যে জলকণায় এই মাত্র তরঙ্গের উৎপত্তি, পরক্ষণে তাহারা মিলিয়া গিয়াছে। আরও আশ্চর্য দেহরূপ তরঙ্গের কণা স্থায়ীও নহে ! পুনশ্চ জলের তরঙ্গ একস্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যায়, কিন্তু জল-কণার স্থানচ্যুতি ঘটে না, তরঙ্গের রূপেরই গতি হইয়া থাকে। আমার পূর্বপুরুষগণের দেহরূপ তরঙ্গে যে সকল অণু ছিল, তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই সে গুলি স্থায়ী ছিল না, আমাতেও সে গুলি নাই, কিম্বা আমার সন্তানেও সে গুলি থাকিবে না। পরম রহস্য এই, যে তরঙ্গ সেই তরঙ্গই আছে ! মানুষের তরঙ্গে মানুষ, গোরুর তরঙ্গে গোরু, ধান্যের তরঙ্গে ধান্য, তিলের তরঙ্গে তিল চির কাল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। নির্বংশ

হইলে সেই তরঙ্গের বিচ্ছেদ ঘটে। এই কারণেই হিন্দুশাস্ত্রকার পুত্র আকাঙ্ক্ষা করেন। তুমি আমি অমর না হইতে পারি, কিন্তু বর্তমান দেহেই তুমি আমি নাই।

বিশ-পঁচিশ বৎসর মধ্যে আমাদের দেহ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। প্রৌঢ় ব্যক্তির লম্বোদরে দেহবৃদ্ধি বুঝায় না বটে, কিন্তু বৃদ্ধি ও পূর্ণতা এক নহে। যৌবনেই দেহ-তরঙ্গের স্থায়িত্ব নির্দিষ্ট হয়। জীবনকালে দেহের যেমন ক্ষয় তাহার তেমনই পূরণ হয়। অবিরত ক্ষয় পাইতে থাকিলে দেহ থাকিবে কেন? আর দেহ না থাকিলেই বা জীবন-শক্তি থাকিবে কেন? শৈশবে ক্ষয় অপেক্ষা পূরণ অধিক, দেহ বাড়িতে থাকে। যৌবনের পর ক্ষয় ও পূরণ সমান চলিতে থাকে, দেহের বৃদ্ধিও শেষ হয়। ইহার পর, পূরণ অপেক্ষা ক্ষয় অধিক হয়, বার্ধক্যের জরা আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি দেহের ক্ষয় পূরণ করিবার ক্ষমতা অপ্রতিহত থাকিত, তাহা হইলে দেহেরও বিনাশ হইত না।

কিন্তু ক্ষয় পূরণ করিবার ক্ষমতা থাকে না কেন? যে ক্ষমতা ছিল, সে ক্ষমতা যায় কেন? কেহ কেহ বলেন, দেহে ক্ষয়িত পদার্থ সঞ্চিত হয়। কিন্তু হয় কেন? ক্ষয়িত পদার্থ দেহ হইতে বহিষ্কৃত করিবার যে ক্ষমতা পূর্বে ছিল, সে ক্ষমতা যায় কেন? এখানে রোগে ভুগিয়া মৃত্যুর কথা বলা হইতেছে না। রোগে মৃত্যু, অপমৃত্যু। জলে ডুবিয়া কিম্বা আগুনে পুড়িয়া মরাও যা, রোগে মরাও তা। বার্ধক্যে জরা আসিয়া যে মৃত্যু ঘটায়, তাহাই প্রকৃত মৃত্যু। কিন্তু সে মৃত্যু হয় কেন?

এইরূপ নানাবিধ অদ্ভুত চিন্তায় মন দোলিত হইতেছিল, কখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে জানিতে পারি নাই। গত সন্ধ্যার বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার, গাছপালা সমুদয় পরিষ্কার। বাল-রবি সময় বুঝিয়া পরিষ্কার আলো ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে রাত্রের কথা আরও পরিষ্কার স্মরণ হইতে লাগিল। বুঝিলাম স্বপ্ন অমূলক চিন্তা নহে।

ইতিহাসের ক্রম।

কেমন ইতিহাস চাই, ইহার কি ক্রম হইলে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইতে পারে, তাহা বলিতেছি।

ইতিহাস শব্দের ব্যাপক অর্থ ধরিলে বিজ্ঞানেও, আধুনিক ভৌতিক বিজ্ঞানেও, ইতিহাস আছে, এবং ইতিহাসে বিজ্ঞান না থাকিলেও বৈজ্ঞানিক মার্গ আছে। ইতিহাস শব্দের মূলে ইতিহ, অর্থাৎ পারম্পর্য্য-উপদেশ। 'ইতিহ',—ইতি—এই, 'হ' নিশ্চয়ে। এই বটে,—এই অর্থে ইতিহ। 'ইতিহ'+'আস',—এইরূপই ছিল, ইহাই হইয়াছিল। এই ছিল, এই হইয়াছিল। সংস্কৃতে ইতিহাস শব্দের ব্যুৎপত্তি এই। অতএব ইতিহাসের নামান্তর পুরাবৃত্ত, পূর্বকালের বৃত্তান্ত। মহাভারত ইতিহাস, অর্থাৎ মহাভারতে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা ছিল, হইয়াছিল। মহাভারত পুরাকালের এক বৃত্তান্ত।

পুরাণও পুরাকালের বৃত্তান্ত। পুরাণ, অর্থাৎ নূতন নহে। লোকে পুরাকালের যে বৃত্তান্ত শুনিয়া আসিতেছে, তাহা পুরাণ। বহু পূর্বকালের কথা, লোক-পরম্পরায় যাহা শুনিয়া আসিতেছি, তাহা পুরাণ। অতি পুরাকালে পৃথিবী জলময় ছিল, ইহা লোক-পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি। সে কথা কেহ লিখিয়াছেন, পুরাণ রচনা করিয়াছেন।

ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ, তিনি যাহা পড়িয়াছিলেন, শুনিয়াছিলেন, তাহা অষ্টাদশ গ্রন্থে নিজের ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। যে-সময়ে তিনি ছিলেন, লিখিয়াছিলেন, সে-সময়ে অপর পুরাণ-কথা ছিল না, এমন নহে। তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা লিখিয়াছেন। যাহা শুনিয়াছিলেন সবই লিখিয়াছেন, কিংবা অবিকল লিখিয়াছেন, এমনও

না হইতে পারে। যত কথা শুনিয়াছিলেন, হয়ত সব লেখেন নাই, লেখার প্রয়োজন মনে করেন নাই।

তিনি শোনেন নাই, অন্যে শুনিয়াছিলেন, এমন কথাও ছিল। অন্যে সে-সব লইয়া অন্য পুরাণ লিখিয়াছেন। ব্যাসের তিরোভাবের পরে অপর পুরাতন কথা শোনা গিয়াছে। অন্যে সে-কথা লইয়া পুরাণ লিখিয়াছেন। এ-গুলার নাম উপ-পুরাণ, অর্থাৎ অধিকপুরাণ, ব্যাসের পুরাণের অতিরিক্ত। ব্যাস যত মান্য ছিলেন, তিনি যত অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছিলেন, অন্য পুরাণ-লেখক তত মান্য ছিলেন না, তত করেন নাই। এইহেতুও ইহাঁদের পুরাণ, উপপুরাণ।

ইতিহাসেও শোনা কথা। ইহাতে দেখা ঘটনার কথা অল্প থাকে, কিংবা আদৌ থাকে না। অতীত ঘটনা শোনা ছাড়া দেখার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ এই,—এইরূপ ছিল, এইরূপ হইয়াছিল,—বলিতে পারা চাই। নতুবা ইতিহাস হইবে না, পুরাণ হইবে। আমি শুনিয়াছি, তুমি শুনিয়াছ, তিনি শুনিয়াছেন,—সমাজ এইপ্রকার ছিল, লোকেরা এই ধর্ম আচরণ করিত, রাজনীতি এই ছিল, যুদ্ধ-কলহ এইরূপ হইয়াছিল, ইত্যাদি। এই প্রত্যয়হেতু ইতিহাস।

শোনা ছাড়া আমাদের জ্ঞানের দেখা বিষয় আছে। আমরা অনেক ঘটনা স্বয়ং দেখিতে পারি, দেখিয়া থাকি। সেটা আদ্য-জ্ঞান, স্বয়ং-জ্ঞান। সেটা শোনা নহে, অন্যের উপদেশ-লব্ধ নহে, স্বয়ং লব্ধ। ইহার নাম উপজ্ঞা। অতএব ইতিহ ও উপজ্ঞা, এই দুইভাগে আমাদের জ্ঞান বিভক্ত করিতে পারি, এবং মানবজাতিসম্বন্ধে এই দুই জ্ঞানকে ইতিহাস বলি।

ইতিহাসের প্রয়োজন কি? এক প্রয়োজন, আমাদের যে স্বাভাবিক ঔৎসুক্য আছে, তাহার নিবৃত্তি। এটা কি সেটা কি, এ জাতি কে সে জাতি কে, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর চাই। অপর প্রয়োজন, অতীত বুঝিয়া বর্তমান ও

ভবিষ্যৎ বুঝিবার ইচ্ছা। বিজ্ঞানেরও জন্ম মানবের ঔৎসুক্যের নিবৃত্তিতে, এবং উদ্দেশ্য, ভবিষ্যৎ প্রয়োগ-প্রবৃত্তিতে। ইতিহাস দ্বারা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নীতি বুঝিতে পারিলে ইতিহাস সার্থক। অমুক অবস্থায় এই জাতি এই নীতি আচরণ করিত, করিয়া এই ফল পাইয়াছিল; সে অবস্থা আমাদের হইলে আমাদেরও নীতি তদ্‌বৎ হইবে, ফলও তদ্‌বৎ হইবে, এই ভবিষ্যৎ স্থচনা করিতে না পারিলে ইতিহাস দ্বারা কেবল ঔৎসুক্যের নিবৃত্তি হয়।

ইতিহাস দ্বারা ভবিষ্যৎস্থচনা হইতে পারে কি না, তাহা পরে দেখিতেছি। প্রথমে দেখি, ঔৎসুক্য-নিবৃত্তির উপায় কি? এ জাতি কে, সে জাতি কে, ইহার উত্তরে এ জাতি হিন্দুজাতি ভারতবর্ষের লোক, সে-জাতি খ্রিষ্টানজাতি ইয়ুরোপের লোক, বলিলে মনের পরিতোষ হয় না, জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয় না। এটা কি গাছ? এটা কদম গাছ; সেটা কি নদী? সেটা মহানদী; ইত্যাদি উত্তরে বালকের সন্তোষ হইতে পারে, বয়স্কের হয় না। কারণ বালকের পক্ষে দুইটা নামই নূতন; সে অন্য গাছ-নদী দেখিয়াছে, তাহার দেখা গাছ-নদীর যে জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানের সহিত কদম ও মহানদী মিলাইয়া তুষ্ট হয়। বয়স্কের জ্ঞান অধিক; সে কদম ও মহানদীর বিশেষ জানিতে চায়। অতএব জিজ্ঞাসুর জ্ঞানের পরিধি অনুসারে উত্তরের পরিধি হইবে।

কিন্তু যে উত্তরই হউক, তাহা সত্য হওয়া চাই। এখানেই সঙ্কট। ইতিহাসের মূলে ইতিহ হউক, উপজ্ঞা হউক, সকলের পরীক্ষা চাই। প্রমাণ দ্বারা সত্য-অসত্যের পরীক্ষা হয়। ইহা স্থূলকথা, সবাই জানে। প্রমাণ কি? সাংখ্যকারিকা বলেন,—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবচন, এই ত্রিবিধ প্রমাণ। এই ত্রিবিধ প্রমাণই পর্যাপ্ত, কারণ যাবতীয় প্রমাণ এই তিনের মধ্যে আছে। যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার নির্ধারণ প্রমাণ হইতেই হয়।

ইতিহাসে প্রত্যক্ষপ্রমাণ কদাচিৎ পাওয়া যায়। ইয়ুরোপের বর্তমান

যুদ্ধের কারণ আমরা জানি না। হয়ত জর্মান-সম্রাট জানেন, তাঁহার মন্ত্রীবর্গ জানেন। কিন্তু তাঁহারা যুদ্ধের ইতিহাস লিখিবেন না; যদিবা লেখেন তাহাতে নিজেদের দোষ লিখিবেন না, নিজেদের প্রমাদ গোপন করিবেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি গিয়া যুদ্ধের ইতিহাস লিখিতে বসিলে সব যে সত্য লিখিব, লিখিতে পারিব, এমন নিশ্চয় নাই। আমি ভ্রমশীল মানবের বাহিরে নই, আমি কল্পনা বর্জন করিতে পারি না। তা ছাড়া, যাহা সত্য ভাবিয়া লিখিব, তাহা আমার অবুদ্ধি-হেতু সত্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা। আমার হয়ত অবধান থাকিবে না, এক ঘটনার সহিত অন্য ঘটনা মিশাইয়া ফেলিব, একেকে ছোট অন্যকে বড় করিয়া বসিব, যে পক্ষে টান আছে সে পক্ষকে বড় করিব, ইত্যাদি। বস্তুতঃ, কেহ দেখিয়াছে, বলিলেই আমরা দর্শকের উক্তি বেদবাক্য মনে করি না। কে দেখিয়াছে; তাহার দেখিবার কি সুযোগ, কি যোগ্যতা ছিল, তাহার বুদ্ধি অব্যাহত ছিল কি না, ইত্যাদি কত তর্ক করি।

বস্তুতঃ কি সত্য কি নহে, কি আছে কি নাই, কে জানে; আমার কাছে কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা। রাত্রিকালে অন্ধকারে পথে সর্প দেখিলাম, অন্যে তাহা রজ্জু দেখিল। আমার নিকট সর্প, অন্যের নিকট রজ্জু। নিদ্রায় কত কি দেখিয়া সত্য ভাবিয়া হৃষ্ট হই, ভীত হই, চমৎকৃত হই। নিদ্রা ভাঙ্গিলে বলি মিথ্যা। শিশু মাটির পুতুলে সত্য মানুষের গুণ আরোপ করে, নচেৎ তাহাতে মুগ্ধ হইত না।

অতএব আমার তোমার তাঁহার দেখা শোনা ঘটনা সত্য না হইতে পারে। কিন্তু আমি তুমি তিনি, বহু বহু লোকে যাহা দেখিয়াছে শুনিয়াছে, তাহাও কি অসত্য হইতে পারে? এত লোকের বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল না বলিতে পারি কি? কিন্তু দেখা যায় একের ভুল নহে, অনেকেরও ভুল হইতে পারে। সূর্য থালার মতন দেখায়। দেখিয়া কে বলিতে পারে তাহা বৃহৎ গোল-

পিণ্ড? পূর্বে লোকে মনে করিত এবং সবাই দেখিত পৃথিবী স্থির, নভোমণ্ডল অস্থির।

যাহা সৎ, যাহা আছে, তাহা সত্য; আর, "সৎসু সাধুসু ভবং" যাহা সাধুব্যক্তি বলেন, তাহাও সত্য। যদি লোকের মতন লোক কেহ দেখিয়া শুনিয়া থাকে, তাহা সত্য হইতে পারে। একদিকে একজনের, অন্যদিকে বহুজনের সাক্ষ্য; কিন্তু একজনের, সজ্জন সাধুজনের, বাক্য বিশ্বাস্য হইতে পারে। কারণ বহুজন মোহাচ্ছন্ন, নির্বোধও হইতে পারে, তাহাদের দেখার যোগ্যতা না থাকিতে পারে। আদালতে একদিকে গ্রামের দশ বার জন যাহা বলে, অন্যদিকে এক সাধুর কথায় তাহা অবিশ্বাস্য হয়। কারণ সাধু পরার্থ সাধন করেন; কারণ তাঁহার মিথ্যা বলিবার প্রলোভন নাই; তিনি সর্বদা এমন আচরণ করেন, যে তাহা কেহ দোষযুক্ত দেখে নাই।

বস্তুতঃ সত্য বলি মিথ্যা বলি, আমার জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে সত্য বা মিথ্যা। আমার সত্য, তোমার জ্ঞানে বিশ্বাসে মিথ্যা হইতে পারে। যাহার নিকট যেটা সত্য, সেটায় তাহার সংশয় নাই; অর্থাৎ সত্য-অসত্য-বিবেককারী জ্ঞাতা অনুসারে কোনটা সত্য কোনটা অসত্য।

কিন্তু যদি জ্ঞাতাভেদে জ্ঞানভেদ সত্যের তারতম্য হয়, যদি জোর করিয়া বলিতে না পারি এটা সত্য, তাহা হইলে কেমন করিয়া লোক-ব্যবহার চলিবে? সত্য-অসত্য-বিবেক না করিয়া লোকযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে না। এস্থলে দেখা যায়, যাহা বহুলোকে সত্য বলে, তাহা সত্য মানিতে হইতেছে। কেবল আমি তুমি নহে, সকলে; মোহাচ্ছন্ন নির্বোধ সকলে নহে, অধিকাংশ লোক যেমন হইয়া থাকে, তেমন জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক যেটা সত্য বলে সেটা সত্য। ইহার অধিক বলিবার সাধন নাই।

অতএব যখন লোকে বলিত পৃথিবী স্থির, তখন তাহাই সত্য ছিল। পুরাণ সত্য, বহুজনের নিকট সত্য; অতএব সত্য। যদি কেহ বলেন পুরাণ

কাল্পনিক কথায় পূর্ণ; উহাতে সত্য-অসত্য দুই আছে। একথা যিনি বলিবেন, তাহাঁকে প্রমাণ করিতে হইবে। না করিতে পারিলে পুরাণ সত্য। কারণ বহুলোকে সত্য মনে করে। এমন প্রমাণ চাই, যাহা সকলেই মানিবে। যাহারা সত্য বলিতেছিল, প্রমাণ দ্বারা তাহাদিগকেও বিশ্বাস করাইতে হইবে, পুরাণ অসত্য।

এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্থান নাই। অনুমান করিতে হইবে। অনুমান ত্রিবিধ। (১) পূর্ববৎ—আকাশে মেঘ দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান করিতেছি। পূর্বে দেখিয়াছি, মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়; এখন মেঘ দেখিতেছি, বৃষ্টির অনুমান করিতেছি। (২) শেষবৎ—নদীর জলবৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান করিতেছি। (৩) সামান্যতো দৃষ্ট—দুই বস্তুর গুণ-সাদৃশ্য দেখিতেছি, দুই বস্তু একজাতীয় অনুমান করিতেছি। একজাতীয় অনুমান করিয়া একে যে গুণ দেখিতেছি, অন্যতে সে গুণ অনুমান করিতেছি।

খ্রিষ্টানেরা বাইবেল-গ্রন্থ সত্য মনে করেন। তাহাঁরা বলেন, স্বয়ং ভগবান্, জিশু নামে অবতার হইয়া, বাইবেল বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু লোকের উক্তি-মাত্রেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। যাহা বহুলোকে বলিতেছে, তাহাও নিঃসংশয়ে গ্রাহ্য হইতে পারে না। নিত্য ঘটনা সম্বন্ধীয় উক্তি আমরা অল্প-প্রমাণে বিশ্বাস করিতে পারি; কিন্তু যে ঘটনা কদাচিৎ ঘটিয়াছে, কিংবা ঘটিতে পারে, তাহার প্রমাণ আরও চাই, দৃঢ় চাই।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা যখন প্রমাণ হয় না, তখন আপ্তবচন প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিবচন আপ্তবচন। আপ্তবচনে সংশয় নাই। যদি কাহারও সংশয় আসে, তাহার পক্ষে আর প্রমাণ নাই। পূর্বে যে সজ্জন সাধুর বচন বলিয়াছি, আপ্তবচন তদপেক্ষা বিশ্বাস্য। আমাদের প্রাচীনেরা দেখিয়াছিলেন, আপ্তবচন মিথ্যা হয় নাই। অতীত ঘটনা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য প্রমাণিত হইয়াছে; ভবিষ্যৎঘটনা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন,

তাহাও মিলিয়াছে। যতগুলা মিলাইতে পারা গিয়াছে, যখন সে-সব মিলিয়াছে, তখন অপর কথাও সত্য মানিতে হইতেছে। এইরূপ যুক্তি দ্বারা আমরা শাস্ত্রকে আপ্তবচন বলি। যখন বলি "শাস্ত্রে" আছে, তখন আর দ্বিরুক্তি করি না।

কিন্তু, আবার সংশয়ে পড়িলাম। পুরাণকার ব্যাস মহর্ষি ছিলেন, শুনিয়াছি ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ছিলেন। একথা মানিতে পারি; কিন্তু ব্যাস মহর্ষির সাক্ষাৎ পাইতেছি না। সাক্ষাৎ পাইলে তিনি আপ্ত কি না, বুঝিয়া লইতে পারিতাম। অনেক সাধু তাহাঁকে আপ্ত বলিয়াছেন; তাহাঁদের উক্তিও শিরোধার্য। কিন্তু সাধুকেও যে চিনিতে চাই। ব্যাসদেবের নামে যে গ্রন্থ লিখিত দেখিতেছি, তাহা বাস্তবিক তিনি লিখিয়াছিলেন কি না, জানিতে পারিতেছি না। অন্ততঃ এখন যে গ্রন্থ পাইতেছি, পড়িতেছি, তাহা তাহাঁর লেখা, সব তাহাঁর লেখা, না হইতে পারে। কে জানে কে কবে ব্যাসের নাম দিয়া নিজের রচনা প্রবেশ করাইয়া দেয় নাই? তা ছাড়া, যদি ব্যাসের বচনও স্বীকার করি, তাহা হইলেও সংশয় যাইতেছে না। তিনি অর্থ বলিয়া দিবেন না, আমাকে অর্থ করিয়া লইতে হইবে। ব্যাস কি উদ্দেশ্যে কি লিখিয়াছিলেন, কি অর্থে কি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে অনুমান করিয়া লইতে হইবে। অতএব যোল কলায় যেমন পূর্ণচন্দ্র, তেমন ষোল কলায় পূর্ণ সত্য ধরিলে ১৬ কলা সত্য দুর্লভ। কোন সত্য ১৫ কলা, কোন সত্য ৮ কলা, কোন সত্য ১ কলা। যাহাতে ১ কলা সত্য, তাহাতে ১৫ কলা অসত্য আছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি আঠার সেনা লইয়া বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিল। যাহাঁরা একথা বলেন, তাহাঁরা আপ্ত নহেন। সামান্যতো দৃষ্টিতে বুঝিতেছি, কথাটা অসত্য। আঠার জন লোক, অশ্বারোহী হউক, অস্ত্রধারী হউক, একটা বিস্তীর্ণ দেশ জয় করিতে পারে না। কথাটা ১৫ কলা কিংবা আরও অধিক মিথ্যা।

কিন্তু ১৬ কলা মিথ্যা, তাহাও বলিতে পারি না। অষ্টাদশ সেনা পারে না, কিংবা পারে নাই, বলিবার প্রমাণ কি ? আর কোথাও পারে নাই, তা বলিয়া এখানেও পারে নাই, এমন বলিতে পারি না।

বাস্তবিক সামান্যতো দৃষ্টিতে যখন কিছু অনুমান করি, তখন সম্ভব-অসম্ভব বিচার করি। মরা মানুষ বাঁচে না, অদ্যাপি কেহ বাঁচিতে দেখে নাই। কত হাজার হাজার লাখ লাখ বছর মানুষ জন্মিয়াছে মরিয়াছে, অদ্যাপি একজনকেও মরিয়া বাঁচিয়া উঠিতে দেখা শোনা যায় নাই। তুমি যে বলিতেছ, লক্ষ্মণ শল্যাহত হইয়া মরিয়া ঔষধ-গুণে বাঁচিয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা তোমার একার, কিংবা দুইদশ হাজার লোকের কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। কারণ একদিকে অসংখ্য মানুষের, অন্যদিকে দুই দশ হাজারের সাক্ষ্য। যদি লক্ষ্মণ বাঁচিয়াছিলেন, তাহা হইলে হয় তিনি মরেন নাই, মৃতবৎ হইয়াছিলেন, মরেন নাই; কিংবা তিনি মানুষ ছিলেন না। আমরা মরা মানুষ বাঁচিতে দেখি নাই; মানুষ-সম্বন্ধেই বলিতে পারি। আমরা মৃতবৎ মানুষকে ভাষায় অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়া বলি, মৃত। লক্ষ্মণও মৃত হন নাই, মৃতবৎ হইয়াছিলেন। তথাপি যখন এত লোক বলিতেছে, তিনি বাস্তবিক মৃত হইয়া পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন, তখন সে কথা ১৬ কলা অসত্যও বলিতে পারি না। লক্ষ্মণের না মরার পক্ষে যদি কোটি কোটি, মরার পক্ষে দুই দশ হাজার কিছুই নহে বটে; কিন্তু নিঃসংশয় হইতেছি না। অর্থাৎ কোটি কোটি, সংখ্যাতীত ঘটনায় যাহা সত্য, একটা ঘটনায় তাহা মিথ্যা হইতে পারে, মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠিতে পারে। এইরূপ, যখন শুনি রাবণের ভাই বিভীষণ অমর, তখন বুঝি তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন বলিয়া লোকে বলিত তিনি অমর, কিংবা বাস্তবিক তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, হইবে না।

এমন কি, যে সূর্য হয়ত সৃষ্টির আরম্ভ হইতে প্রত্যহ উদিত ও অস্তগত

হইয়া আসিতেছে, সে সূর্য যে একদিন উদয়াস্ত-রুদ্ধ হইয়া নিশ্চল থাকিবে না, তাহা বলিতে পারি না। তবে যদি কেহ বলেন, আগামী কল্য সূর্যোদয় হইবে না, তখন তাহাঁর উক্তি অবিশ্বাস্য হইবে। অবিশ্বাস্য হইবে; কিন্তু নিসংশয়ে বলিতে পারি না, কল্য সূর্যোদয় হইবেই হইবে। বলিতে পারি কল্য সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পক্ষে কোটি কোটি, বিপক্ষে এক। কিন্তু কে জানে, কল্য সেই এক ঘটিবে না। সংশয় অসংশয়ের যে সম্বন্ধ, তাহার নাম সম্ভাবনা। একদিকে অল্প, অন্যদিকে বহু সম্ভাবনা থাকিলেও যখন অল্প জয়ী হয়, তখন বলি দৈব।

আমরা কার্যকারণ-সম্বন্ধ যত বুঝিতেছি, দৈব তত লুপ্ত হইতেছে। বিধাতার বিধান-ভঙ্গের নাম দৈব। বিধাতার বিধান, ভৌতিক জগতের বিধান, আমরা সব জানি না, বুঝি না। জানিলে বুঝিতে পারিলে বিধানের ব্যভিচার দৈবাধীন ঘটনা বলিতাম না। হিন্দুজাতি ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে; যত জন্মিতেছে তাহার অধিক মরিতেছে; সুতরাং শেষে কেহ থাকিবে না। অনেক প্রাচীনজাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুজাতির উৎসেদ একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু বিধাতার বিধান জানি না। অতি প্রাচীনজাতি লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া হিন্দুজাতিও যে তদ্‌বৎ লুপ্ত হইবে, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না। বলিতে পারি, লোপের দিকে চলিয়াছে, এবং যদি লোপের প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে কয়েক শত বৎসর পরে হিন্দু-জাতি লুপ্ত হইবে; অর্থাৎ যে বিধান এখন চলিতেছে, ঠিক সে বিধান চিরদিন থাকিলে লুপ্ত হইবে। কিন্তু জাগতিক বিধান জগৎ-বিধাতা জানেন; আমরা জানি না।

উপরে যে বিচারমার্গ প্রদর্শিত হইল, তাহা বিজ্ঞানেরও মার্গ। বিজ্ঞানের অন্বেষণও ত্রিবিধ প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত। প্রভেদ এই, বিজ্ঞান আপ্তেরও প্রমাণ চায়। বিজ্ঞানের আপ্তপ্রমাণ এমন যে, তুমি আমি সেও সে প্রমাণ পরীক্ষা

করিতে পারিবে। যেখানে এত কড়াকড়ি, যেখানকার বিচারক মমতাহীন চক্ষু-লজ্জাহীন হইয়া সত্য অসত্যের তুলনা করিতেছেন, সেখানে বিজ্ঞানের প্রমাণ আপ্তুতুল্য গণ্য হইতেছে।

বাইবেলে আছে ছয়দিনে স্থাবরজঙ্গমাত্মক পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছিল। বিজ্ঞান বলিতেছে,—না, হয় নাই, অমনই সকলকে মাথা নোআইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে, বলিতে হইতেছে—না, পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্ট হয় নাই। বিজ্ঞানের যে এত গৌরব, এত দর্প, তাহার কারণ বিজ্ঞানের সত্যবাদিতা, বিজ্ঞানের নিঃস্বার্থপরতা। তাহার দয়া-মায়া নাই, তুমি-আমি ভেদজ্ঞান নাই, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে, তাহা অকুতোভয়ে স্পষ্টভাষায় শোনাইয়া দেয়। বিজ্ঞানের যুক্তিমার্গ বিজ্ঞানকে বড় করিয়াছে। এমন করিয়াছে, যে অন্য যাবতীয় বিদ্যাতে সে মার্গ দেখিতে না পাইলে মনের পরিতোষ হয় না।

কিন্তু এখানে একটু সাবধান হইতে হইবে। ব্যাসদেবের নামে যেমন কত কথা প্রচারিত হইয়াছে, তেমন বিজ্ঞানের নামেও হইতেছে। "শাস্ত্রে আছে" বলিয়া অনেকে যেমন শ্রোতার সংশয় চাপা দিতে চায়, এখানেও তেমন বিজ্ঞানের নামের জোরে অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রচার করে। বিজ্ঞান তোমার আমার কথা, কিংবা তোমার আমার মনগড়া কথা নহে। বিজ্ঞান বলে না, সে সর্বজ্ঞ; বরং বলে "আমি কিছুই জানি না, জানিতে চাই; এই যে অল্পস্বল্প জানিয়াছি, অজানার তুলনায় ইহা কিছুই নয়।" বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করুন, চাঁদে মানুষ আছে কি? বলিবে, জানি না। জিজ্ঞাসা করুন, ইহকালের পর পরলোক আছে কি না। উত্তর হইবে, জানি না। অত কথায় কাজ কি, জিজ্ঞাসা করুন, মানুষ মরিয়া ভূত-প্রেত হয় কি না। বলিবে, জানি না। যদি বলেন, জানি আছে; বিজ্ঞান তর্ক করিবে না। যদি বলেন, বিশ্বাস কর ভূত-প্রেত আছে; বলিবে প্রমাণ দিন, এমন প্রমাণ দিন যাহাতে আমার বিশ্বাস হইবে। একদিকে, বিজ্ঞান যেটা পাইয়াছে সেটা কিছুতেই

"না" বলিবে না, অন্যদিকে যেটা না পাইয়াছে সেটা "হাঁ" "না" কিছুই বলে না। এটা হইতে পারে না, মানুষ নিজ দেহ লঘু করিয়া শূন্যে থাকিতে পারে না, মানুষ মরিয়া বাঁচিতে পারে না, ইত্যাদি বিজ্ঞানের নিকট শুনিবেন না। যেটা তাহার জানা আছে, সে সেটার সম্বন্ধেই বলিতে পারে। সে জানে, অনেক অজানা আছে ; যেটা জানে মনে করিতেছে, সেটাও সম্পূর্ণ জানে না।

ইহার নাম বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি। ইতিহাসে এই বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি দেখিতে চাই। ইতিহাসে অনেক অজানা কথা থাকে। অনেক মন-গড়া কথার দ্বারা ইতিহাস-লেখক আমাদিগকে ভুলাইতে চান। সবসময়ে নিজেরাও সাবধান হন না ; মন-গড়া কথাতে নিজেরাও ভুলিয়া যান। অঙ্গীকারের উপর অঙ্গীকার চাপাইয়া শেষে নিজের একটা অনুমান সত্য বলিতে চান। ইতিহাসের ঊহ বাদ দিলে কতটুকু সত্য থাকে ? বিজ্ঞানেও ঊহ আছে, এবং বিজ্ঞানে কেন, নিত্যজীবনেও ঊহ আমাদের সহচর। পরে পরে সব তথ্য জানা থাকে না। তথ্যগুলি পরস্পর গাঁথিতে ঊহ আশ্রয় করিতে হয়। কিন্তু, কোন্‌টা ঊহ, কোন্‌টা তথ্য, তাহা স্পষ্ট বলিয়া না দিলে সত্য অসত্য মিশিয়া যায়।

তা ছাড়া, বিজ্ঞানের তথ্যসমূহ এমন শৃঙ্খলায় সম্বদ্ধ থাকে যে, উদ্দেশ্য বুঝিতে কষ্ট হয় না। আজিকালি যে বিষয়ই আলোচনা করি, বিচার করি, এইরূপ সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে না পারিলে চিত্তের সন্তোষ হয় না, পড়িতে বুঝিতে মনে রাখিতে কষ্ট হয়। ইতিহাসে বহু চমৎকার তথ্য, বহু জ্ঞানের কথা থাকিতে পারে, এক বৈজ্ঞানিক বিন্যাসের অভাবে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। ইতিহাসে বৈজ্ঞানিকমার্গ যেমন আবশ্যক, বৈজ্ঞানিক বিন্যাসও তেমন আবশ্যক।

এই বিন্যাসের নিমিত্ত ইতিহাস কালানুসারী হয়। ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা কাল পরিমিত হয়, এবং কাল দ্বারা ঘটনা পারম্পর্যের এবং সত্যাসত্যের নির্ণয় হইয়া থাকে। বাস্তবিক এক এক ইতিহাস এক এক মানবজাতির

উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ের বৃত্তান্ত। আমরা উৎপত্তি জানিতে পারি না; কোন্ নিসর্গজ বস্তুর উৎপত্তি জানি? যদি বলি ছোটনাগপুরের কোল জাতি বেদের সময় ছিল, এবং তৎকালে দস্যুনামে আখ্যাত হইত, তাহা হইলে স্থিতির একাংশ, অতীতাংশ, অতীতাংশের এক ক্ষুদ্রাংশ বুঝিলাম, উৎপত্তি বুঝিলাম না। প্রাচীন কোলেরা যে দস্যু ছিল, কিংবা বেদের দস্যু বর্তমান কোলজাতির পূর্বপুরুষ, ইহা প্রমাণের নিমিত্ত প্রাচীন হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত মাঝে মাঝে নিদর্শন চাই। কটকে একটা নদী আর সমুদ্রতীরে একটা নদী দেখিলে যেমন বলিতে পারি না, দুই নদী একেরই দুই অংশ, তেমন এখানেও পারি না। সমস্ত নদী না দেখি, মাঝে মাঝে যোগ দেখা চাই। এই যোগ দেখিতে না পারিলে, বৈজ্ঞানিকবিন্যাস না থাকিলে, ইতিহাস উপকথা হয়।

বাস্তবিক এমন জাতি কদাচিৎ দেখা যায়, যাহা বহুকাল অন্যজাতির সংসর্গে থাকিয়াও স্বতন্ত্র রহিয়াছে। কেননা, সেজাতি স্বাতন্ত্র্য আকাঙ্ক্ষা করিলেও পার্শ্ববর্তী জাতি তাহা ভঙ্গ করিতে পারে, দৈবঘটনায় হইতে পারে। বহু কোল খ্রিষ্টান হইয়াছে। তাহারা সকলেই স্বেচ্ছায় খ্রিষ্টান হইয়াছে কি না কে জানে। যদি বা হইয়া থাকে, খ্রিষ্টান পাদরি না গেলে খ্রিষ্টান হইত না। এইরূপ, যে জাতির ইতিহাস দেখি, তাহার কোন চেষ্টার ইতিহাস, ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাস, রীতিনীতির ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস দেখি, তাহার সহিত পার্শ্ববর্তীজাতির ইতিহাস জানিতে বুঝিতে হইবে। ইতিহাস অদ্যাপি বিজ্ঞান-পদবী পায় নাই। ইহার কারণ ইহা নহে যে, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূলগত পার্থক্য আছে। ইতিহাসে সংশয় আছে, বিজ্ঞানেও আছে। কারণ এই, মানবের ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান অত্যন্ত জটিল, বহুমানব-গোষ্ঠীর ইতিহাস আরও জটিল।

এই প্রবন্ধের প্রথমে ইতিহাসের প্রয়োজন উল্লেখ করিয়াছি। এক

প্রয়োজন, আমাদের স্বাভাবিক ঔৎসুক্যের নিবৃত্তি। ইহার কারণ আর কিছু নহে, আমি আমার ক্ষেত্র বুঝিতে চাই। আমি আছি, কিন্তু একা নই। আমার সুখদুঃখ অন্যের কর্মদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়; আমি এই অন্যের, আমা-ছাড়া মানবের স্বভাব-চরিত্র বুঝিতে চাই। কাহার সহিত বাস করিতেছি, তাহা জানিয়া নিজের দুঃখের মাত্রা অল্প, সুখের মাত্রা অধিক করিতে চাই। এইকারণে দেশের ইতিহাস জানিতে চাই। দেশে কে ছিলেন, কেমন ব্যবহার করিতেন, তাঁহার বংশ আছে কি না, থাকিলে সে বংশের চরিত কেমন, ইত্যাদি আমার প্রতিবেশীর আদ্যন্ত স্বভাবচরিত জানিতে চাই। মানব-ছাড়া যে দেশ, তাহার জ্ঞান ভূগোলে পাই। অতএব ইতিহাস ও ভূগোল আমার বিচরণ-ক্ষেত্রের বিবরণ। প্রাণরক্ষার্থে যেমন আমার দেহতত্ত্ব জানা আবশ্যক, তেমন আমার দেশের ইতিহাস ও ভূগোল জানাও আবশ্যক। কারণ আমি'র জ্ঞান, আমি'র ক্ষেত্র-জ্ঞানের সহিত সম্বদ্ধ। আমার ক্ষেত্র বুঝিবার সম্ভাবনা দেখিয়া আমি আমার দূরবর্তী দেশের ইতিহাস ও ভূগোলও অবগত হইতে চাই, দ্বিতীয় প্রয়োজনে আসিয়া পড়ি, জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতে, অতীত ও বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে প্রবেশ করিতে চাই। যে ইতিহাস ও ভূগোলে আমার ভবিষ্যৎ বুঝিবার সাহায্য না পাই, তাহা আখ্যান হইতে পারে, ইতিহাস হইতে পারে না। তেমনই যে বিজ্ঞানে জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতের, বর্তমান হইতে ভবিষ্যতের সূচনা না থাকে তাহা বিজ্ঞান নহে, তাহা দ্রব্য-গুণ-কর্মের তালিকা। অদ্যাপি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস রচিত হইতে পারিয়াছে কি না জানি না, হইবে কি না সন্দেহ। কারণ যে ক্ষেত্রে মানবজাতি বাস করিতেছে, সে ক্ষেত্র পৃথক করিয়া প্রত্যেক অংশের কার্য-নিরূপণ অসাধ্য। গোটাকয়েক স্থূলকথা অবশ্য আছে; যেমন রাজা অত্যাচারী হইলে প্রজাও হয়, যেমন এক জাতি অন্যের সংসর্গে না আসিলে স্বয়ং ভাল কিংবা মন্দের দিকে যায় না, ইত্যাদি।

কারণ ক্ষেত্র বুঝিতে গেলেই ক্ষেত্রস্বামী বুঝিতে হয়। ক্ষেত্র-স্বামী মানব; তাহার চরিত্র বোঝা সহজ নহে। এই শিষ্ট শান্ত জাতি, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে পণ্ডিত-জাতি; তাহার মধ্যে একজন দুর্দান্ত হইয়া উঠিল। এই দুর্দান্ত জাতি তাহার মধ্যে একজন শান্তিপ্রিয় বৈরাগী জন্মগ্রহণ করিল, এমন হইল যে, সেজাতির মতিগতি পরিবর্তিত হইয়া গেল। মুসলমান-রাজত্ব সময়ে কে জানিত চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া দেশে প্রেমরসের প্রবাহ চালাইয়া দিবেন। মোগলরাজ্য বেশ চলিতেছিল; কে জানিত ঔরঙ্গজেবের প্রবল প্রতাপে সব উলট-পালট হইয়া পড়িবে।

জীববিদ্যাতেও ঠিক এইরূপ অসম্ভাবিত জীবের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। ঝাড়ের বাঁশ হইতে হঠাৎ একটা বাঁশ দীর্ঘ হইয়া উঠিল, যেন প্রকৃতির কূর্দন। এইরূপ, মানবসমাজে এক এক মানুষ প্রকৃতির কূর্দন-স্বরূপ। কে জানিত কালাপাহাড় কূর্দন করিতে জন্মিবে। এই যে কূর্দন, এই যে কেলি, তাহা গণিয়া বলিবার নহে; কখন আসিবে, কি আকারে দেখা দিবে, তাহা কেহ জানে না।

এই অসম্ভব কাণ্ড না ঘটিলে সব দেশের ইতিহাস প্রায় একরূপ হইত। অবশ্য, ক্ষেত্রভেদে, প্রান্তর-পর্বত নদ-সমুদ্র শীত-গ্রীষ্ম ভোজ্য-পানীয় প্রভৃতি ভেদে লোকচরিত্র প্রভেদ হইবে। গ্রীষ্মদেশের গাছ শীতদেশে বাড়ে না, মরিয়া যায়। মানুষ মরে না, কারণ মানুষ বুদ্ধিশালী, বুদ্ধিবলে প্রকৃতির পরিবর্তন অগ্রাহ্য করিতে পারে। কিন্তু কোন্ দিকে কোন্ মানুষের বুদ্ধি খুলিবে, তাহা কতক জানিতে পারা যায়, কতক পারা যায় না। উর্বরভূমির, নদী-মাতৃকা-ভূমির মানুষ অলস হইয়া পড়ে, সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের মানুষ ধীবর হয়, পার্বত্যদেশের লোক কষ্টসহিষ্ণু হয়, ইত্যাদি কয়েকটা স্থূলবৃত্তান্ত জানা যাইতে পারে। কিন্তু, এসব ছাড়া, মানুষ ইচ্ছা করিয়া দশজনের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এক এক বিধি-ব্যবস্থা চালাইতে পারে, যাহার ফলে সে মানুষ

অন্য হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। এই কারণে, এই দৈব-হেতু, মানুষের ইতিহাসে বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতা অসম্ভব হইয়াছে, ইতিহাস বহুপরিমাণে লেখকের বিতর্কে পূর্ণ হইতেছে, "বোধ হয় হইয়াছিল" "বোধ হয় হয় নাই" ইত্যাদি "বোধ হয়" পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে। যখন "বোধ হয়"-এর ছড়াছড়ি, তখন সত্য অপ্রকাশিত। এই কারণে, "কাহার বোধ হইয়াছে" "কে বলিতেছে", ইহা জানা আবশ্যক। অনেকস্থলে এক জনের, যিনি আপ্ত নহেন এমন একজনের, "বোধ হয়" ইতিহাসের নামে লোকে পড়িতেছে।

ইতিহাসকে একটা সুরম্য হর্ম্য মনে করা যাইতে পারে। হর্ম্য-নির্মাণের নিমিত্ত ইট-পাথর-কাঠ-লোহা প্রভৃতি উপদান চাই, প্রত্যেক উপাদানের দৃঢ়তা পরীক্ষা করা চাই, কে সে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে, কে পরীক্ষা করিয়াছে, কবে পরীক্ষা করিয়াছে, ইহা উপাদানের গায়ে ছাপ মারিয়া দেখাইয়া দেওয়া চাই। ইহার অভাবে তথ্য কি শোনা-কথা, গল্প-কথা কি মন-গড়া কথা, কিছুই বুঝিবার উপায় থাকে না। যিনি যে ইতিহাসই লিখুন, যত বৃহৎ ইতিহাসই লিখুন, তাহাঁকে আপ্ত স্বীকার করিতে পারি না। তাহাঁর বিতর্ক রাখিয়া দিয়া তিনি পরীক্ষিত প্রমাণিত তথ্যগুলি পর পর সাজাইয়া গেলে পাঠক নিজে ইতিহাস রচনা করিতে পারেন। পাঠকের সাহায্যের নিমিত্ত ইতিহাসকার উপাদানগুলি যথাযোগ্য স্থানে বসাইয়া নিজের কল্পনা দ্বারা গাঁথিয়া সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণে প্রয়াসী হন। প্রাচীন ভারতের, অর্বাচীন ভারতের ইতিহাসের বহু উপাদান এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত লুক্কায়িত অপ্রকাশিত আছে, কিন্তু ইতিহাসের সুরম্য হর্ম্য নির্মিত হয় নাই। এই কারণে আমরা বলি আমাদের দেশের ইতিহাস নাই। ইহার এমন অর্থ নহে যে, ইতিহাসের উপাদান নাই। আবশ্যক যাবতীয় উপাদান না থাকিতে পারে; শিল্পী দুই পাঁচটা উপাদানের অভাবেও মনোহারী অট্টালিকা নির্মাণ করিতে পারেন।

অতএব ইতিহাস-রচনা যার-তার কর্ম নহে। যে-সে স্থপতি ভুবনেশ্বরের

মন্দির গড়িতে পারিত না। যিনি শিল্পী তিনি গড়িয়াছেন, যে-সে স্থপতির কর্ম নয়। আমি ইতিহাস পড়িতেছি, কিম্বা দুই দশটা উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি বলিয়া আমার ঐতিহাসিকতা জন্মে না। আদালতে কত বিচারক নিত্য সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন, রায় প্রকাশ করিতেছেন, ঘটনা ব্যাখ্যা করিতেছেন, কিন্তু তাহা ইতিহাস নহে। কদাচিৎ কোনটা ইতিহাস, কোনটা বিচারকের মত বা রায়, অধিকাংশ ইট-কাঠের ঢিপি।

এখানেও বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কত শত জন বিজ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন, সংগ্রহ করিয়া জীবন শেষ করিতেছেন, তা বলিয়া তাঁহারা বৈজ্ঞানিক নহেন। যিনি বিজ্ঞান-শিল্পী, বিজ্ঞান-দার্শনিক, তিনি বৈজ্ঞানিক, অন্যে নহেন। তিনি বিপুল গ্রন্থ না লিখুন, তিনি সমুদায় উপাদান না জানুন, (সমুদায় উপাদান ত জানিবার নহে), বৈজ্ঞানিক হইতে পারেন। একারণ বৈজ্ঞানিককে কবি বলিতে পারা যায়, ঐতিহাসিককেও বলিতে পারা যায়। যেমন ছন্দ অনুসারে অক্ষর সাজাইয়া গেলেই কবি হয় না, তেমন উপাদানগুলা পর পর সাজাইয়া গেলেই ঐতিহাসিক হইতে পারা যায় না। কবিত্ব দুর্লভ, ঐতিহাসিকতাও দুর্লভ।

আমাদের দেশে ঐতিহাসিক ছিলেন, মহর্ষি ব্যাস। মহাভারতের তুল্য ইতিহাস দুর্লভ। পদ্যে রচিত বলিয়া ইতিহাসের দোষ হয় নাই, বরং গুণ বাড়িয়াছে। অষ্টাদশ পুরাণের বংশানুচরিত ইতিহাস বই আর কি ?

কিন্তু কেহ কেহ বলেন, মহাভারত ইতিহাস নহে, পুরাণ ইতিহাস নহে। কেন নহে, কি অর্থে নহে ? মহাভারত ও পুরাণে মন-গড়া কবি-কল্পিত কথা আছে কি ? উপাদান, বৃত্তান্ত অসত্য কি ? উপাদান যথাযথ বিন্যস্ত হয় নাই কি ? গ্রন্থনে কলাকৌশল প্রকাশ পায় নাই কি ?

মনগড়া কথা আছে, কিন্তু সব মনগড়া অসত্য বলিতে পারি না; অতিশয়োক্তি থাকিতে পারে, উক্তি মিথ্যা নহে; বিন্যাসে গ্রন্থনে দোষ নাই।

একটা অভাব, কালানুসারিতা নাই। সময় নির্দেশ না থাকাতে এক বৃত্তান্তের সহিত অন্য বৃত্তান্তের, এক পুরাণের সহিত অন্য পুরাণের মিল করিতে পারি না; পরে পরে বৃত্তান্ত না পাইয়া ইতিহাস-অট্টালিকার গোড়া কোথায়, আগা কোথায় বুঝিতে পারি না।

একটা শ্লোক আছে, লোকমুখে প্রচলিত শ্লোক আছে, সত্যযুগে অত্রি, ত্রেতায় চরক, দ্বাপরে সুশ্রুত, কলিতে বাগ্‌ভট আয়ুর্বেদ লিখিয়াছিলেন। এখানে সময়ের উল্লেখ আছে, অথচ নাই। যদি সত্য-ত্রেতাদিযুগ পাঁজির যুগ হয়, তাহা হইলে কথাটা বিচারেরও যোগ্য নহে। কারণ সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ, বহু বহু বৎসর পূর্বে হইয়া গিয়াছে।

যদি বলি সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই নাম চতুষ্টয়ে কালের পৌর্বাপর্যমাত্র বিজ্ঞাপিত হইয়াছে; অর্থাৎ যে কাল চলিতেছে, তাহা কলি, এবং যে কাল অতীত হইয়াছে, তাহা তিন ভাগ করিয়া কলির পূর্বে অতীত দ্বাপর, তাহার পূর্বে অতীত ত্রেতা, তাহার পূর্বে অতীত সত্যযুগ ছিল, তাহা হইলে বরং একটা সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায়। অর্থাৎ বুঝিলাম আত্রেয় সংহিতা প্রথমে, তার পর চরক সংহিতা, তার পর সুশ্রুত সংহিতা, এবং তার পর বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গ-হৃদয় রচিত হইয়াছিল। এই প্রতিজ্ঞার বিরোধী প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

কিন্তু, বিরোধী প্রমাণ নাই কিংবা পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইল না। বস্তুতঃ রাগিণীর যেমন অসংবাদী ও বিবাদী রাগিণী বা সুর আছে, প্রতিজ্ঞারও সংবাদী, অনুবাদী প্রমাণ পাইলে এবং বিবাদী প্রমাণ না থাকিলে সে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয়। কেহ বলিল, রাবণের দশমুণ্ড ছিল। এই উক্তি-মাত্র গ্রাহ্য হইতে পারে না; ইহার বিবাদী, বিরোধী প্রমাণ না থাকিলেও উক্তি গ্রাহ্য হইবে না। দশমুণ্ড থাকার সংবাদী, অনুবাদী প্রমাণ চাই। এইরূপে দেখা যায় আয়ুর্বেদের যে ইতিহাস জানা গিয়াছে, তাহাতে আত্রেয়াদি চারি আয়ুর্বেদের পৌর্বাপর্যে আত্রেয় সর্বপুরাতন, বাগ্‌ভট সর্বনূতন বটে।

এইসব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতেছি ইতিহাসে কালনির্ণয় অত্যাবশ্যক। কাল-দ্বারা যে প্রমাণ তাহার পরীক্ষার উপায় পাওয়া যাইতে পারে। এ দেশে এক রাজা ছিলেন; এটা কথামাত্র, ইতিহাস নহে। সত্যযুগে মান্ধাতা নামে এক রাজা ছিলেন; বুঝিলাম বহুপূর্বকালে। কলির আরম্ভ সময়ে কিংবা দ্বাপর শেষে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল, এখানে জ্ঞান অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত হইল। যেখানে কালের উল্লেখ নাই, সেখানে ইতিহাস নাই।

কিন্তু বৎসর ধরিয়া সকল ঘটনার উল্লেখ না করিলেও ইতিহাস হইতে পারে। মাঝে মাঝে বিশেষ দুই একটা ঘটনার বৎসর জানিলেই ইতিহাস গড়িতে বুঝিতে বিঘ্ন হয় না। যে ঘটনা লিপিবদ্ধ হইতেছে, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত বৎসরের উল্লেখ আবশ্যক হয়। যখন সত্যাসত্য নির্ধারণ আবশ্যক হয় না, যখন অন্য প্রমাণে জানি অসত্য নাই, তখন বৎসরের উল্লেখ না থাকিলেও চলে। এই যুক্তিতে মহাভারতের যুদ্ধ সত্য, পুরাণের বর্ণিত বংশ ও বংশানুচরিত অসত্য নহে। পুরাণের পাঁচ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে বংশ ও বংশানুচরিত দুই লক্ষণ। আধুনিক ইতিহাসেও এই দুই থাকে। যে-সে বংশ নহে; যে বংশ এক এক জাতির ও দেশের ভাগ্যের নিয়ামক হইয়াছিলেন, তেমন বংশের বর্ণনা। বংশানুচরিত-বর্ণনা, ইতিহাসে থাকে, পুরাণেও আছে। ব্যাসদেবের পর কত ব্যাস বংশানুচরিত লিখিয়া গিয়াছেন তাহাঁদের সংখ্যা হয় না। দেশের রাজবংশের ইতিহাস ছিল, আমাদের দেশে পূর্বকালে মান্য গণ্য যাবতীয় বংশের ইতিহাস ছিল। এই সকল কুলপঞ্জী দ্বারা জানা যাইতেছে, আমাদের ইতিহাস চিরদিন লিখিত হইয়া আসিতেছিল। পুরীর মাদলা-পাঁজি, আসামের বুরুঞ্জি, ইতিহাস। অতএব আমাদের দেশে ইতিহাস ছিল না, নাই, এ কথা বলা দুঃসাহস। ইতিহাসের উপাদান আছে, নাই ঐতিহাসিক।

ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক মার্গ চাই, নতুবা তাহা বিশ্বাস্য হইবে না।

বৈজ্ঞানিক মার্গে লিখিত ইতিহাসের একটা গুণ এই যে. পড়িবা-মাত্র তাহা পাঠককে মানিতে হয়। অন্যদিকে, অন্য বিদ্যায় ঐতিহাসিক ক্রম অবলম্বিত হইলে জ্ঞাতব্য বিষয় সহজ হইয়া পড়ে। কেননা, কাহার পর কি হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসে জানিতে পারি, জ্ঞানের পর পর যোগ জানিতে জানিতে বর্তমানে আসিয়া পড়ি। ইহাই আবশ্যক। সমাজবিদ্যা ধরি, ভাষাবিদ্যা ধরি, যে কোন বিদ্যাই ধরি, ঐতিহাসিক ক্রমে শিক্ষা করাতে কত দুরূহ বিষয় সহজ হইয়া গিয়াছে।

ইতিহাসের নামে নভেল লিখিতে বলি না, এক কথা ফেনাইয়া ফেনাইয়া লঘু করিতে বলি না ; কারণ ফেনাইতে গেলেই অসত্য আসিবে। কিন্তু রচনার লালিত্য ও বিন্যাসের সুস্পষ্ট ক্রমে বৈজ্ঞানিক মার্গ চাই। "বোধ হয় হইয়াছিল", "বোধ হয় হয় নাই", "হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না" ইত্যাদির প্রয়োগ বাস্তবিক আবশ্যক হয় কি ? যদি হয়, তাহা পৃথক না বলিলে সত্য-অসত্য মিশিয়া যায়, আদ্যোপান্ত গোটা বই পড়িয়া জ্ঞানলাভ হয় না।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া দেখা গেল, যে-সে য'-তা লইয়া ইতিহাস লিখিতে পারেন না। ইতিহাস শব্দের অর্থ হইতে বুঝিতেছি, উহা পড়িলে সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইবে। শোনা কথা হউক, দেখা ঘটনা হউক, সত্য নির্ণয় চিরদিন দুরূহ। এইকারণে অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় ইতিহাসেও বিতর্কের সমাপ্তি নাই। অথচ বিতর্কে চিত্ত তৃপ্ত হয় না। একটা-না-একটা ঠিক ধরিতে চায়। এই আকাঙ্ক্ষা হইতে প্রাচীনকালে আপ্তপ্রমাণ গৃহীত হইয়াছিল। একালে আমরা আপ্ত পাই না, অনুমান প্রমাণে সমুদায় সিদ্ধ করিতে চাই। এই হেতু ইতিহাসে বৈজ্ঞানিকমার্গ অনুসরণ আবশ্যক, এবং যে ইতিহাসে এই মার্গ নাই, বিন্যাস নাই, তাহা ইতিহাস নামের যোগ্য নহে। তাহা পুরাণ হইতে পারে, গল্প হইতে পারে, কিন্তু ইতিহাস হইবে না। যদিও মহাভারত আধুনিক ইতিহাসের ধারায় লিখিত নহে, তথাপি ইহার অর্থযুক্ত কথা হেতু অতিশয়

মূল্যবান্। এককালের মানবসমাজের এমন উজ্জ্বল সুস্পষ্ট চিত্র দুর্লভ। ইহাতে পরে পরে বহু আখ্যান যোজিত হইয়াছে, কোন কোন স্থানে সমধিক হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু সর্বত্র সূত্রটি স্পষ্ট আছে। ইতিহাস পড়িতেই হইবে, শুনিতেই হইবে, নতুবা আমাদের চরিত্রের ধারা বুঝিতে পারি না। শুধু তথ্য, অসম্বদ্ধ তথ্য, অথবা একটা দুইটা তথ্য ধরিয়া রচিত বিপুল গ্রন্থে যদি আমার সম্বন্ধ, মানবজাতির সম্বন্ধ, স্পষ্ট দেখিতে না পাই, তাহা হইলে তাহাকে ইতিহাস বলিতে পারি না। সমুদ্রতটের বালুকাকণা হইতে দূরের অতিদূরের তারকার বৃত্তান্ত লিখিতে পারেন; কিন্তু শুধু সত্য, আমাকে ছাড়িয়া সত্য, হাজার বলুন, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। এই কারণে প্রথমে নিজের দেশের ইতিহাস চাই, পরে অন্যদেশের; প্রথমে দেশের ভূগোল চাই, পরে অন্যদেশের। এই কারণে পূর্বকালে ইতিহাসের মধ্যে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র, ও অর্থশাস্ত্র, সব ধরা হইত। ধর্মশাস্ত্র আইন, অর্থশাস্ত্র জীবনোপায়। এসবই ইতিহাসের উপকরণ।

স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ।

আজ-কাল আমরা স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাচীন বিধি বিস্মৃত হইতেছি। পশ্চিম দেশীয় বিধিও গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। অল্পে অল্পে বহুকালে দেশীয় বিধির উৎপত্তি হইয়াছে। পশ্চিম দেশেও সেইরূপ সে দেশের বিধি হইয়াছে। কিন্তু দেশ ও পাত্র সমান না হওয়াতে বিধি সমান হইতে পারে নাই। এখন কালের ধর্মে ইতঃ নষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ হওয়াতে আমাদের স্বাস্থ্য ও আয়ুর হানি হইতেছে। স্বাস্থ্যের তুল্য মহামূল্য আর কিছুই নাই। স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছুই লাভ হয় না।

পূর্বকালে গুরুজনেরা বালকবালিকাদিগকে নিত্যাচার শেখাইতেন। কারণ বাল্যকাল হইতে অভ্যাস না করিলে নিত্যকর্মে ভুল হয়, করিতে কষ্ট বোধ হয়। এখানে সমুদায় স্বাস্থ্য-বিধি বলিবার স্থান নাই। দুই একটা বলিয়া অন্য বিধি জানিয়া লইতে বলিতেছি। প্রথমে •

দন্তমার্জন

ধরি। আমরা দন্ত মার্জন করি বটে, কিন্তু যেমন তেমন করিয়া কাজটি শেষ করি। কেহ কেহ তাহাও করে না। গ্রামে কেহ এ গাছের সে গাছের কচি ডাল লইয়া দাঁত মাজে; কেহ বা ঘুঁটের পাঁশ দিয়া মাজে। শহরে দন্তকাষ্ঠ সুলভ নহে। অনেকের নিকট আঙ্গুলই দন্তকাষ্ঠ হইয়া থাকে। কেহ ঘুঁটে পাঁশ, কেহ চা-খড়ি, কেহ বা কাঠের কয়লা দিয়া দাঁত মাজে। এমন নির্বোধও আছে, বালুকা-মিশ্রিত মৃত্তিকা দিয়া দাঁত ঘষিয়া দাঁতের ক্ষয় করে। কিন্তু আঙ্গুলই দন্ত-কাষ্ঠ থাকে। আঙ্গুল দিয়া দাঁতের মাত্র সম্মুখ ভাগ মাজিতে পারা যায়, প্রত্যেক দাঁতের পাশ কিংবা ভিতর পিঠ কিংবা মাড়ির নিকটস্থ অংশ মাজিতে পারা যায় না। আমরা ফলমূল-ভোজী হইলে

দন্তমার্জন আবশ্যক হইত না ; চর্বণের সঙ্গো সঙ্গো দন্ত পরিষ্কৃত হইত। পক্ব অন্ন, সিদ্ধ কোমল অন্ন ভোজনে অন্নজাত ক্লেদ দন্তমূলে, পার্শ্বে পৃষ্ঠে লাগিয়া যায় ; পচিয়া দুর্গন্ধ হয় ; কোটি কোটি অণুজীবের ক্ষেত্র রচিত হয়। কালে দন্তমূলে পুষ্পিকার উৎপত্তি হয়। অচিরে দন্তরোগ, অচিরে মন্দাগ্নি ও অজীর্ণ, অচিরে দেহের রস দুষ্ট হয় ; নানা ব্যাধিও আগমন করে।

কেহ কেহ সর্বদা পান চিবাইতে থাকে। দাঁতের বিশ্রাম নাই, যেন অজর ! লালা-নিঃসরণের অবধি নাই, যেন অফুরন্ত ! সর্বদা চর্বণে দাঁত শীঘ্র ক্ষয় পায়, বৃদ্ধ বয়সে নিম্নাংশ মাত্র থাকে, তদ্দ্বারা চর্বণ চলে না। হাতী দীর্ঘজীবী, রোগে মরে না, আহার বিনা মরে। ডালের কাঠ চিবাইয়া চিবাইয়া দাঁত ক্ষয় হয়, আহার বন্ধ হয়। সর্বদা পান চিবাইলে মুখ কখনও নির্মল থাকে না ; কোটি কোটি অণুজীব স্বচ্ছন্দে পুষ্ট ও বর্ধিত হইতে থাকে ; পানের চূণের ক্ষারে দন্তবেষ্ট শিথিল হইতে থাকে। আহারান্তে তাম্বুল-চর্বণ প্রশস্ত বটে। কিন্তু আহারান্তে আচমনও বিহিত। দেহ নির্মল না রাখিলে স্বস্থ থাকিতে পারা যায় না। দন্তমার্জন উপেক্ষার বিষয় নহে। আমরা মাংস তত খাই না, তাই কতক রক্ষা। মাংসাশী সাহেব-দিগের দন্তরোগ যত, আমাদের তত নয়।

শহরে কেহ কেহ বুরুষ দিয়া দাঁত মাজে। বুরুষ মন্দ নয় ; যদি পরিষ্কৃত ও নির্মল রাখিতে পারা যায়, যদি প্রত্যহ নূতন বুরুষ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা দুঃসাধ্য। তার উপর কোন্ পশুর, কোন্ রোগাক্রান্ত পশুর লোমে বুরুষ নির্মিত হইয়া আসিয়াছে, তাই বা কে জানে ! যে মুখ সর্বদা পবিত্র রাখা কর্তব্য, সে মুখে কেমন করিয়া সে বুরুষ প্রবিষ্ট করাইতে পারি ! কেহ কেহ বুরুষে 'টুথ পাউডার' কেহবা 'কার্বলিক টুথ পাউডার' নামক দন্ত-শোধক চূর্ণ লইয়া দাঁত মাজিয়া থাকেন। কিন্তু কার্বলিক তৈলাক্ত চূর্ণে দন্ত-পৃষ্ঠের অণুজীবের কি ধ্বংস করিবে, যখন বুরুষই অণুজীবের বাসভূমি হইয়াছে !

বুরুষ দুই তিন দিন অন্তর ফেলিয়া দিতে পারিলে, কিংবা ফুটন্ত জলে ডুবাইয়া শুদ্ধ করিয়া লইতে পারিলে চলিত।

আর এত কষ্টেই বা যাই কেন? স্বচ্ছন্দ-বনজাত দন্তকাষ্ঠের অভাব কি আছে? এমন নির্দোষ, এমন পবিত্র এত কাষ্ঠ আছে, যার কুর্চিকা মৃদু; শিথিল দন্তবেষ্টেও প্রযোজ্য। ওড়িয্যায় কুমারী-লতার দাঁতন প্রসিদ্ধ। ইহার রসের স্বাদ নাই। বাবলার দাঁতন আরও উত্তম। ইহার কুর্চিকা মৃদু কিন্তু দৃঢ়। নিমের তিক্তরসে মুখ শোধন হয়, কিন্তু কুর্চিকা কোমল নহে। প্রত্যহ যে নূতন দাঁতন কাটিতে হইবে, তাহাও নহে। শুখাইয়া গেলে রাত্রে জলে ফেলিয়া রাখিলে পরদিন নমনীয় হয়। দাঁতে চিবাইয়া কুর্চিকা করিতে না পারিলে নোড়া দিয়া ছেঁচিয়া লইতে পারা যায়।

তার পর মার্জন। কিন্তু দন্ত-শোধন-চূর্ণ কিছু চাই। চা-খড়ি, ঘুঁটে পাঁশ অহিতকর। ক্ষারীয় দ্রব্য মাত্রই অহিতকর। কোমল অঙ্গার-চূর্ণ নির্দোষ। অনেকে সুপারী পোড়াইয়া গুঁড়াইয়া সরু কাপড়ে ছাঁকিয়া দন্ত-চূর্ণ করিয়া থাকেন। ইহার সহিত দুই চারি ফোঁটা সরিষার তেল মিশাইলে আরও ভাল। সুগন্ধ ও সুস্বাদু করিতে হইলে অন্য দ্রব্য মিশাইতে হইবে। অন্যের মধ্যে দারুচিনি-চূর্ণ প্রসিদ্ধ। এই চূর্ণ লইয়া দাঁতন দিয়া প্রত্যেক দাঁত একটি একটি করিয়া উপর নীচে পাশে মনোনিবেশপূর্বক ঘষিতে হইবে। ৩২টা দাঁত; দুই এক মিনিটের কর্ম কি?

কেহ কেহ বাজারের 'দন্ত মঞ্জন' দাঁতে লাগাইয়া মনে করেন, দাঁত আর নড়িবে না, মূল হইতে রক্তস্রাব হইবে না। কিন্তু যখনই দেখি, 'মার্জন' নয়, 'মঞ্জন', তখনই বুঝি, বিক্রেতা দাঁতের কিছুই জানে না। 'মঞ্জন' বলিয়া কোন শব্দ নাই। মণ্ডন বুঝি, সে কালে নারী স্বীয় দন্ত মসী-মণ্ডিত করিত। মসী-মণ্ডিত করা উদ্দেশ্য নয়, মিসীর কষায় লৌহ-যোগে মসী হইত। কিন্তু অন্য বিষয়ে চূর্ণ নির্দোষ বরং হিত-কারক। 'দন্ত মঞ্জনের' অতিকটু চূর্ণে

দন্তমূল অবসন্ন হয়, ব্যথা থাকিলে ব্যথা বৃদ্ধি হয়। এইরূপ, তামাকের গুল, কিংবা বিষ-তামাক দিয়া দাঁত ঘষিলে উগ্র বীর্যে দেহের অহিত হয়, অণুজীবের বিনাশ হয় না। চাই মার্জন, দন্তের নির্মলতা। ইহার সহিত মুখের রুচি, লঘুতা ও সুগন্ধ হইলে আরও উত্তম।

ব্যায়াম

ব্যায়াম শুনিলে আজকাল অনেকে মনে করেন গুরুভার মুদ্গার চাই, কিংবা ইস্কুলে যে লৌহ ও কাষ্ঠ নির্মিত দণ্ড থাকে, সে সব না হইলে ব্যায়াম হয় না। অথচ শব্দটি বি+আয়াম, বিশেষ ভাবে বিস্তার করা, লম্বা করা। অতএব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা করিতে আর কিছু না থাকিলে চলে, মন না থাকিলে চলে না। মন থাকিলে দাঁড়াইয়া বসিয়া শুইয়া পেশী প্রসারিত করিতে পারা যায়। স্বাস্থ্য-রক্ষার নিমিত্ত ইহারই প্রয়োজন, মল্লক্রীড়া নয়। বি-আয়াম দ্বারা শরীর লঘু হয়, কর্ম-সমর্থ হয়, সুঠাম সুবলন হয়, এবং অগ্নি-বৃদ্ধি হয়। কেহ কেহ মনে করেন, যাঁহারা বসিয়া থাকিয়া লেখা পড়ার কর্ম করেন, ব্যায়াম কেবল তাহাঁদের আবশ্যক। কিন্তু তা নয়। কর্মকার হাতুড়ী দিয়া লোহা পিটিতেছে, কৃষক কোদাল দিয়া মাটি কোপাইতেছে, নাবিক দাঁড় টানিয়া নৌকা বাহিতেছে, কিন্তু এই এই কর্মে এক এক অঙ্গের চালনা হইতেছে। যে অঙ্গের হইতেছে, সে অঙ্গ পুষ্ট; যে অঙ্গের হইতেছে না, সে অঙ্গ ক্ষীণ। ইহাদের দেহ সুঠাম নয়। কর্মের পর শরীর লঘু হয় না, ক্লান্ত হয়।

নিত্য কর্মের পূর্বে ব্যায়াম, পরে নয়। বৈকালে বা সন্ধ্যায় ব্যায়াম নয়; প্রাতে ব্যায়াম, স্নানের পূর্বে ব্যায়াম। যে ব্যায়ামের কথা বলিতেছি, তাহা স্নানের পূর্বে তেল মাখিবার সময় স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। তাহাতে অভ্যঙ্গ ও ব্যায়াম, দুইই হইতে পারে। একথা সত্য, অল্প লোক বসিতে

জানে, দাঁড়াইতে জানে, বেড়াইতে জানে। যাহারা জানে, তাহারাও সব সময়ে জানে না, ভুলিয়া যায়, কর্মে অভ্যাস হয় নাই। তেল মাখিবার সময় পাঁচবার কি দশবার যাবতীয় নমনীয় অঙ্গ নোয়াইতে, যাবতীয় প্রসারীয় অঙ্গ প্রসারিত করিতে, যাবতীয় ঘূর্ণনীয় অঙ্গ ঘুরাইতে বালক বৃদ্ধ নরনারী সকলেই পারে। কিন্তু মনোনিবেশ পূর্বক এবং ধীরে ধীরে করিতে হইবে। যে ব্যায়াম সকলের সাধ্য না হয়, সে ব্যায়াম হিতকরও নয়। সাধারণে মল্ল হইতে চায় না। স্ফীত বাহু ও স্থূল পেশী সুন্দরও নয়।

সন্ধ্যার সময় একটু বেড়াইয়া কেহ কেহ মনে করেন, অঙ্গচালনা করা হইল। কিন্তু সহজেই বুঝি, ভ্রমণের দ্বারা সকল অঙ্গের ব্যায়াম হয় না। যা হয়, তাও ভাল হয় না। শতকে একজন বেড়াইতেও জানেন না! হাঁটা আর বেড়ানা, কিংবা পরিক্রমণ আর পরিভ্রমণ এক নয়। লোকে হাঁটে, কেহ শীঘ্র, কেহ মন্দ। কিন্তু মন পড়িয়া থাকে অন্য বিষয়ে। তখন হাঁটা মাত্র হয়, পায়ের হয়ত ক্লান্তি হয়। অনেকের নিকট খেলা ও ব্যায়াম একার্থ হইয়াছে। কিন্তু খেলা, খেলা; ব্যায়াম, বি-আয়াম। কোন্ খেলায় কোন্ অঙ্গের চালনা হয়, এবং কোন্ অঙ্গের হয় না, তাহা অল্পেই বুঝিতে পারা যায়।

•

অভ্যঙ্গ

ব্যায়ামের পর অভ্যঙ্গ। লোকে বলে আভাং করিয়া তেল মাখ। কিন্তু আভাং অর্থে গায়ে খানিকটা তেল লেপা নয়। তৈল মর্দন না করিলে অভ্যঙ্গ হয় না। অভ্যঙ্গ করিলে দেহের জরা ও শ্রান্তি দূর হয়; বল ও বর্ণ, সুখ ও নিদ্রা, কোমলতা ও পুষ্টি সাধন হয়। অভ্যঙ্গের এত গুণ; কিন্তু দুই এক মিনিটের কর্ম নয়। মর্দন না করিয়া তেল মাখিলে দেহের বর্ণ ও কোমলতা সাধিত হয়, অন্য ফল হয় না।

আমাদের এই গ্রীষ্মদেশে প্রখর রৌদ্রের তেজ প্রতিহত করিতে গায়ে তেল চাই। বাতাসে কত প্রকার ধূলি, কত অণুজীব উড়িয়া আসিয়া গায়ে পড়ে। তেলে সে সব জড়াইয়া যায় এবং স্নানে দূরীভূত হয়। অণুজীব-বিনাশের শক্তিও তেলের আছে। এই হেতু তেলে ডুবাইয়া আম কুল প্রভৃতির আচার রক্ষিত হয়। এই নিমিত্ত সর্ষপ তেল প্রসিদ্ধ। চিত্তের প্রসন্নতা ইচ্ছা করিলে গন্ধ-তৈল চাই।

অনেকের জ্ঞান আছে, তেলে দেহের মলা দূর হয় না। তাই তাঁহারা সাবান মাখেন। কিন্তু সাবানের একমাত্র গুণ, দেহের মলা দূর করে। কিন্তু তেলেরও সে গুণ আছে। আমাদের গাত্র হইতে ঘর্ম ও এক প্রকার ঘৃত নির্গত হয়। তেলে এই ঘৃত মিশিয়া যায়। ঘর্ম ক্ষারীয়। তৈল ও ক্ষার যোগে যাবতীয় সাবানের উৎপত্তি। অতএব তেল মাখিয়া আমরা দেহে সাবানই মাখি। অনেক সাবানে ক্ষার অধিক, সে সাবান গায়ে মাখিলে চর্ম রূক্ষ হয়, ক্ষয়ও পায়। তৈলাক্ত সাবান মাখিলে সে দোষ থাকে না। কিন্তু যখন তিল তেল আছে, তখন অজ্ঞাত সাবান মাখিব কেন? সরিষার তেল অপেক্ষা তিল তেলে মলাপহত্ব অধিক। ইহা চর্মের, কেশের ও চক্ষুর হিতকর। পূর্বকালে হরিদ্রা ও তিল বাটিয়া মাখা হইত। এই ব্যবস্থা উত্তম ছিল। তিলের সহিত আমলকী বাটিয়া মাখিলে দেহের বর্ণ ও প্রসন্নতা ঘটে। পূর্বকালে ইহার নাম ছিল উদ্‌বর্তন। আমরা এখন সে আবাটা ভুলিয়া গিয়াছি।

আমরা তেল ঘি অতি অল্প খাই। তেল অধিক খাইবার বস্তু নহে; ঘি দুর্লভ। যাঁহারা প্রচুর ঘৃত ভোজন করেন, তাঁহাদের দেহ স্নিগ্ধ থাকে, তেল মাখিবার প্রয়োজন প্রায় হয় না। ঘৃত ভোজনে বল, বর্ণ ও পুষ্টি সম্পাদিত হয়। যদি ঘি প্রচুর না পাই, তেল খাদ্য না হয়, গায়ে তৈল মর্দন করিয়া লোম-কূপের ভিতর দিয়া দেহে প্রবেশিত করিলে প্রায় সেই ফল হয়।

আহারীয়

দুঃখের বিষয় ঘৃত দুর্মূল্য হইয়াছে। 'আয়ুর্ঘৃতং' আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। ঘৃতের তুল্য আহারীয় আর একটী নাই। গব্যঘৃত শ্রেষ্ঠ। ইহা মেধা, লাবণ্য, কান্তি, ওজঃ, তেজঃ বৃদ্ধি করে। ইহা বয়ঃস্থাপক ও বলকর; সুগন্ধ ও রোচন। একটু অভ্যাস হইলে সদ্যজাত মাহিষ্যঘৃতও রুচিকর হয়। ভাতে না খাই, ব্যঞ্জনে ঘি অবশ্য চাই। কিন্তু দেখিতে হইবে, ভাগে অল্প না হয়। আমরা দরিদ্র বলিয়া ঘি খাই না, এমন নহে। উত্তর-ভারতও দরিদ্র; কিন্তু ঘৃতের গুণ ভোলে নাই। কারণ 'তৈলং মর্দয়েৎ নতু খাদয়েৎ'। আরও দেখা যায়, বঙ্গ ও ওড়িষ্যা ছাড়া ভারতে আর কোথাও সরিষা তেল চলিত নাই। মান্দ্রাজের বহুস্থানে লোকে তিল তেল খায়। অন্য স্থানে ও বোম্বাইতে নারিকেল তেল। কিন্তু আমরা খাই সরিষা তেল, খাঁটি সরিষা তেল। কিন্তু এই তেল উষ্ণ-বীর্য, তীক্ষ্ণ। প্রত্যহ পলাণ্ডু ও লঙ্কা, প্রত্যহ প্রচুর উপস্কর যোগে পক্ক ব্যঞ্জন খাইলে অন্নপাক-যন্ত্র পীড়িত হয়। প্রত্যহ সরিষার তেল ও সরিষা-বাটা দ্বারাও তেমন হয়। তিল তেলের সে দোষ নাই। উহা বল-বর্ণকর ও পুষ্টিকর। আমাদের অভ্যাস নাই বলিয়া মনে করি, তিল তেলে ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না। কিন্তু কোন্ ব্যঞ্জন রুচিকর, কোন্ ব্যঞ্জন নহে, তাহা অভ্যাসের ফল। সরিষা-বাটার পরিবর্তে তিল-বাটা স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। ইদানী তিলের লাড়ু, তিলিয়া পাটালি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। কিন্তু উপাদান দেখিলে তিল ও বাদাম প্রায় সমান।

বাঙ্গালী ঘৃত-প্রিয় না হইলেও দুগ্ধ-প্রিয়। কিন্তু এক আধ পোয়া দুধে কতই বা সার থাকে? এক সের দুধে ঘি তিন তোলা, ও ছেনা সাড়ে তিন তোলা মাত্র। যে দুধ বালক ও বৃদ্ধের জীবন, যে দুধ পূর্বে প্রচুর পাওয়া যাইত, এখন তাহা দুর্লভ। গো যে দেশে ধনের মধ্যে গণ্য, সে দেশে

টিনের কৌটার বাসি দুধ ও মাখন খাইতে হইতেছে, এমন ভাগ্য-বিপর্যয় আর কি আছে ? গো-পালনে রত না হইলে এ দুর্দশা ঘুচিবে না।

নব্য-শিক্ষিত মনে করেন ভাত কিছু নয়। ভাত খায় বলিয়া পশ্চিমার নিকট ভেতো বাঙ্গালী নিন্দার কথা হইয়াছে। কিন্তু, ভেতো বলিয়াই বাঙ্গালীর বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়। ভাত বল ও পুষ্টিকারক, অথচ যব ও গোধূম অপেক্ষা লঘু। পরিপাকে নির্দোষ অন্ন এমন আর কি আছে ? গুরুপাক-ভোজী মনে করে, লঘুপাক-ভোজীর বল নাই। ভাতের দোষ এই, অধিক খাইতে হয়, অন্য দ্রব্য সংযোগে খাইতে হয়। বাঙ্গালী দাল খায়, মাছ খায়, দুধ খায়। দাল-রুটি অপেক্ষা এই সংযোগ উত্তম। শাক্ত বাঙ্গালী মাংসও খায়। এখন পায় না, কিন্তু, তাহার আহারীয়ের দোষ দিতে পারা যায় না। অবশ্য দাদখানি চাল ও কলের ছাঁটা চালে সারাংশ অল্প। এই দুইকে রোগীর পথ্য বলা যাইতে পারে। অনেকে মনে করেন, ভাতের ফেনে সারবস্তু চলিয়া যায়। অতএব ফেন না গালিয়া ভাত খাওয়া কর্তব্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। ভাতের ফেনে সারবস্তু থাকে না। বরং চালে যে এক উগ্র বস্তু আছে, তাহা ফেনে ধৌত হইয়া ভাতকে নির্দোষ করে। সকলে যে আতপ অন্ন জীর্ণ করিতে পারে না, তাহারও কারণ এই। বাঙ্গালী ও জাপানীর আহারীয় প্রায় এক। জাপানীও ভাত খায়, মাছ খায়, দাল খায়, কিন্তু, খায় না তেল বা ঘি। ইহার কারণ আছে। তাহার ভাত ও দাল, আমাদের ভাত ও দাল অপেক্ষা বল ও পুষ্টিকর। জাপানীর ভাত শর্করা-ঘৃত-যুক্ত বলা যাইতে পারে। সে দেশের চালে শর্করা ও ঘৃতের ভাগ আছে। দ্বিতীয়তঃ, জাপানীর দাল আরও ভিন্ন। এই দালকে তাহারা সো-য়ু বলে। এ দেশেও এই কলাই আছে। কোথাও বলে গরি কলাই, কোথাও বলে ভাট কলাই। চাল, দাল, আটা, ময়দার সেরে আট নয় তোলা জল থাকে। এই জল বাদে যাহা থাকে, তাহাকে গুণে তিন ভাগ করিতে পারা যায়,—পুষ্টিদ, বল্য ও

তেজস্কর। এই ভাগের এমন অর্থ নয় যে বল্য দ্রব্য পুষ্টিদ নয়, পুষ্টিদ বল্য নয়, বা তেজস্কর নয়। ঘি তেজস্কর, কিন্তু পুষ্টিদও বটে, বল্যও বটে। এইরূপ ছেনা ও মাংস পুষ্টিদ কিন্তু বল্য বটে, তেজস্করও বটে। কেবল ভাগের ইতর বিশেষ। আমাদের চালে পুষ্টিদ অল্প, বল্য অধিক, তেজস্কর নাই। চাল ও গম অপেক্ষা যব শ্রেষ্ঠ। আমাদের একসের দালে পুষ্টিদ প্রায় ২০ তোলা, বল্য প্রায় দ্বিগুণ, তেজস্কর নাম মাত্র। এই হেতু প্রকৃতি যেন বলিয়া দিতেছেন, অন্নে ঘৃত চাই, দালে ঘৃত চাই। কিন্তু গরি কলাইতে পুষ্টিদ ২৮ তোলা, বল্য ২০ তোলা, তেজস্কর ১৫ তোলা। অতএব ভাতের উপাদানের অভাব জাপানীর সো-য়ূ দ্বারা পূর্ণ হয়, ইহাতে তেলের ভাগ এত বলিয়াই জাপানীকে অন্য তেল প্রায় খাইতে হয় না। যে অন্ন স্বল্প খায়, সে তিল তেল।

ঘি, দুধ, মাছ যখন দুর্লভ হইতেছে, তখন দুইবেলা ভাত খাওয়া আর কর্তব্য হইতেছে না। কলিকাতা-বাসী একবেলা ভাত, একবেলা রুটি ধরিয়া ভাল করিয়াছে। যাঁতায় ভাঙ্গা আটা এবং মুগ ও মসুর দাল আরও প্রচলিত না হইলে বাঙ্গালী কৃশ ও নির্জীব হইয়া পড়িবে। রুটির দোষ এই, গড়িতে সেকিতে সময় লাগে। সময়ে সময়ে কাঁচাও যে না থাকে, তাও নয়; এই কারণে সকলের পথ্যও নয়। ঘি দুর্মূল্য না হইলে লুচীর ব্যবস্থা করা যাইতে পারিত। সুপক্ক হইলে পাঁওরুটি উত্তম। রাত্রে ভাত ছাড়িতে পারিলে যবের ছাতু, গমের আটা অন্য প্রকারে পাক করিয়া লঘু করা যাইতে পারিবে।

তরকারির উল্লেখ করা হয় নাই। কারণ উহা ব্যঞ্জন মাত্র, ভোজ্যের অনুচর মাত্র। যত অল্পে চলে, ততই ভাল। আমরা বলি, শাগ-পাতি কিংবা আনাজ। সংস্কৃতে বলে, এবং বঙ্গ ও ওড়িষ্যা ছাড়া সর্বত্র বলে, শাক। হিতোপদেশে পড়িয়াছিলাম, "স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্যতে।"

তখন মনে হইয়াছিল, শাগ খাইয়া বাঁচিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু শাক অর্থে, কেবল পত্র-শাক নহে। সংস্কৃতে শাক অর্থে, বৃক্ষের যাবতীয় কোমল ও পাক দ্বারা খাদ্য অংশ। শাক নানাবিধ যথা,—পত্র-শাক, যেমন পালং ও কলমী; পুষ্পশাক, যেমন মোচা ও সজিনা ফুল; ফলশাক, যেমন কুমড়া, লাউ; নালশাক, যেমন নটিয়া ডাঁটা; কন্দ শাক, যেমন ওল ও কচু; মূলশাক, যেমন মূলা; কাণ্ডশাক, যেমন থোড়; করীর শাক, যেমন বাঁশের কলি; অগ্রশাক, যেমন বেতের অগ্র; অধিরূঢ়ক শাক, যেমন তাল বৃক্ষের মজ্জা; কবক, যেমন ছত্রাক (বেঙ্গের ছাতি); ত্বক্-শাক, যেমন নেবুর খোলা। অতএব যাহাকে আমরা আজ-কাল নিরামিষ তরকারি বলি, তাহার সংস্কৃত নাম শাক। অনেক রোগে কবিরাজ মহাশয়েরা পথ্যে শাগ ও অম্বল বারণ করিয়া থাকেন। কারণ স্থূলতঃ "শাকেষু সর্ব্বেষু নিবসন্তি রোগাঃ।" কিন্তু তাহাঁরা রোগীকে শাকের অর্থ বলিয়া দেন না। সে যাহা হউক, অধিকাংশ শাকে তিন গুণের একটাও নাই বলিতে পারা যায়। থাকিবার মধ্যে লবণের অংশ আছে; কিন্তু সে লবণ অল্প হইলেই চলে। আলু, কাঁচকলা, কচু, মান প্রভৃতি কয়েকটা প্রায় ভাতের তুল্য। দেহের পোষণ কর্মে শাকের বিশেষ প্রয়োজন আছে, কিন্তু অধিক নহে।

দিবাভাগে মধ্যাহ্নে ভোজন; রাত্রে নয়টার মধ্যে ভোজন প্রশস্ত। কিন্তু রাত্রের ভোজন লঘু হওয়া উচিত। কারণ রাত্রি বিশ্রামের কাল। সে সময় অন্নপাক-যন্ত্রের কর্ম লঘু না হইলে দেহের বিশ্রাম হয় না। এই দুই ভোজনই ভোজন। অন্য সময়ে কিছু না খাইলে কোন ক্ষতি নাই। যদি খাইতে হয়, তাহা হইলে সেটা জল-পান। ভোজন অপেক্ষা নিশ্চয়ই লঘু হইবে। লঘু পথ্য জলপানের মধ্যে বাতাসা, চিনী, মিছরী ও জল। কিংবা দুই একটা সন্দেশ ও জল যথেষ্ট হইতে পারে। পরিমাণে অধিক খুঁজিলে খই, মুড়ি, মুড়কি, চিড়া-ভাজা আছে; নারিকেল কিংবা ঘৃত-যুক্ত হইলে

উত্তম হয়। তিল-ভাজা কিংবা তিলিয়া লাড়ু, কিংবা যাহাদের অগ্নি প্রবল, তাহারা ছোলা-ভাজা যোগ করিতে পারে। ছোলা-ভাজা অপেক্ষা ছোলা-ভিজা দেহের পোষণকর্মে আরও ভাল।

আমাদের দেশে নানা ফল আছে। ফল-ভক্ষণ দেহের হিতকর। এত প্রকার জলখাবার থাকিতে বিলাতী বিস্কুটের প্রয়োজন হইতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে, বিস্কুট পুরাণা হইতে পারে; তখন তাহা বিষ-তুল্য। আমাদের দেশে বহুলোক তিনবার ভাত খায়; জাপানেও খায়। কিন্তু তিন বারই ভাত না খাইয়া একবার অন্য কিছু খাইলে ভোজ্যের পরিবর্তন হয়। এইরূপ মাসের ত্রিশদিন ভোজ্য একই হইলে পরিপাক-যন্ত্র ক্লান্ত হয়, এবং দেহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অভাব পূরণ হয় না। শেষ কথা এই, খাদ্য মাত্রেই ভোজ্য নহে। যে দ্রব্যে অভিলাষ না হয়, খাইতে খাইতে তৃপ্তি বোধ না হয়, তাহা খাদ্য হইতে পারে; কিন্তু ভোজ্য নয়।

অবিধি

কতক আমাদের দোষে, কতক কালের দোষে এত অবিধি আচরিত হইতেছে; সে সবের ফলে আমরা কৃশ, দুর্বল, রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছি। এখানে সকল অবিধি উল্লেখের স্থান হইবে না। কয়েকটা সবাই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু করিয়াও নিশ্চিন্ত আছেন। এইরূপ ঔদাসীন্য অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা যার নাই, সে আর জীবিত কই? দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল, ধর্মজন্য শৌর্য, শৌর্যজন্য বিনয়, অদম্য উৎসাহ, এবং দীর্ঘ আয়ুঃ,—এ সব কই?

প্রথম অবিধি বস্ত্র-ধারণে। কেহ কেহ দিবারাত্রি গায়ে গেঞ্জি আঁটিয়া বসিয়া থাকেন। কিন্তু গায়ে আলো বাতাস না লাগিলে দেহ ভাল থাকিবে কেন? শীতকালে গায়ে কাপড় দিতেই হইবে। কিন্তু তখনও টানা গেঞ্জি

ভাল নয়। গেঞ্জির উৎপত্তি গ্রীষ্ম দেশে নয়, শীত দেশে। আমাদের দেশে পাতলা কাপড়ের ঢিলা জামা প্রশস্ত। আরও ভাল, শুধু চাদর। একখানায় শীত না গেলে, দুখানা, তিনখানা। বাল্যকাল হইতে দেহ যত শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-সহ হয়, অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষাও তত হয়। আমাদের দীর্ঘজীবী পূর্ব পুরুষগণ এইরূপেই কাল কাটাইয়া গিয়াছেন। আমরা মনে করিতেছি, দেশটা বিলাত হইয়া গিয়াছে। তা নইলে যে সময়ে গায়ে কাপড় রাখিতে ইচ্ছা হয় না, ঠিক সে সময়ে দুপর বেলা পায়ে পুরু মোজার উপরে বায়ুরোধক চর্ম হইতে লংক্লথের নিবিড় কামিজ, চাপকান, চোগা প্রভৃতি কাপড় জড়াইতে পারিতাম না। কাল কাপড় গরম; তাই বিলাতে এত কাল কাপড়। কিন্তু, আমরা কোন্ বুদ্ধিতে কাল কাপড় গায়ে দিই, মাথায় কাল টুপি আঁটি, কাল পাগড়ী পরি? কোন্ বুদ্ধিতে কাল ছাতা দ্বারা মাথায় সূর্যতেজ কেন্দ্রীভূত করি? বিলাতে কাল পরে পরুক, আমরা কেন পরি? বিলাতে কাল ছাতা চাই, আমাদেরও কি চাই? যদি অন্য কাপড়ের না পাই, উপরে সাদা কাপড় দিতে পারি।

মধ্যাহ্নে পরিশ্রম আর এক অবিধি। আমাদের দেশে এ অবিধি ছিল না। পূর্বাহ্ণে এবং অপরাহ্ণে শারীরিক ও মানসিক সকল কর্ম করা হইত। মেক্সিকো গ্রীষ্ম দেশ; সে দেশেও এই বিধি। মধ্যাহ্নে ভোজন ও বিশ্রাম, ইহাই প্রকৃতির আদেশ। বর্তমান অবিধির আনুষঙ্গিক কুবিধিও আছে। দশটার সময় কর্মস্থানে উপস্থিত হইতে হয়। তাহার অন্ততঃ একঘণ্টা পূর্বে ভোজন করিতে হয়। তাড়াতাড়ি রান্না ভাল হয় না, ভোজনও হয় না। এক দিন নয়, দশ দিন নয়। আরো ভয়ানক, আহারান্তেই কর্মস্থলের দিকে ধাবিত হইতে হয়। প্রাচীনেরা বলিয়া গিয়াছেন, এইরূপে মৃত্যুকে আহ্বান করা হয়। কর্মের সময় ১০টা হইতে ৫টায় সুবিধা আছে বটে, কিন্তু, কর্মই কি কাম্য? আরও আশ্চর্য, যাহাদের সময় নিজেদের হাতে, তাহারাও

মধ্যাহ্নে কর্ম করিতেছে! ব্যবসায়ী, বণিক, কারু, ভৃতিক, কার্মিক সকলেই নূতন অবিধি ধরিয়াছে। সুখের বিষয়, গ্রামে এই অবিধি এখনও প্রবেশ করে নাই। মনে রাখা উচিত, ইহা দ্বারা দেশের আয়ু শোষিত হইতেছে।

মানুষ যে অবস্থায় পড়ে, অন্যান্য জীবের ন্যায় সে নিজেকে সেই অবস্থার উপযোগী করিয়া থাকে। কতক ইচ্ছায়, কতক অনিচ্ছায় তাহার শরীর ও মনের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। এই পরিবর্তন হঠাৎ ঘটিলেই বিপদ। তখন অনেককে বিকলাঙ্গ হইয়া কোনরূপে কয়েকদিন কাটাইতে হয়, কিংবা অকালে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। বিকলাঙ্গের দৃষ্টান্ত ইস্কুল ও কলেজের বালকদিগের দূরদৃষ্টিহীনতা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কি প্রবলবেগে পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য লক্ষণ-স্বরূপ কাচময় প্রতিচক্ষু এদেশে ব্যাপ্ত হইতেছে! প্রকৃতির শাসন, নিষ্ঠুর শাসন। যিনি যে অঙ্গের কিংবা যে বৃত্তির চালনা করেন না, প্রকৃতি তাহাঁকে সে অঙ্গ কিংবা বৃত্তি হইতে মুক্তিদান করেন। সৃষ্টির মধ্যে অনাবশ্যকের স্থান নাই। ক্ষুদ্রগৃহে আবদ্ধ থাকিয়া দিবারাত্রি ক্ষুদ্রাক্ষর দেখিতে দেখিতে চক্ষুর দূর-দৃষ্টি লোপ পায়। দিবসে নিজের গৃহে এবং হয় ত বিদ্যালয়েও আলো অল্প, কিন্তু রাত্রে কেরোসীন দীপের প্রচণ্ড রশ্মি চক্ষে পড়িতে থাকে, অগ্নি দ্বারা মস্তিষ্ক উষ্ণ, এবং দুর্গন্ধ দ্বারা দেহের রক্ত কলুষিত হইতে থাকে। গ্রামের আট-চালা যে ভাল ছিল, মাটির প্রদীপ রেড়ীর তেল যে ভাল ছিল।

যাহাঁরা শিক্ষিত, তাহাঁদেরই কথা হইতেছে। চোখে চশমা, অজীর্ণরোগ, অকালপক্ক কেশ শিথিল দন্ত, নমিত দেহ ও মলিন বদন,—এ সব নিশ্চয়ই অবিধির ফল। পূর্বকালে পরমায়ু ১০৮ বৎসর ধরা হইত। ৭৫ বর্ষ উত্তীর্ণ না হইলে মধ্যায়ু বলা হইত। এখন দীর্ঘায়ু মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায় সকলেই ৬৪ বৎসর দেখিতে না দেখিতেই গতায়ুঃ হইতেছেন। আমাদের শারীরিক অবনতি চিন্তার বিষয়।

বরপণ।

সম্প্রতি ইংরেজী-শিক্ষিত হিন্দু সমাজে বরপণ-গ্রহণ একটা প্রবল ব্যাধি-স্বরূপ হইয়াছে। অনেকে ইহার প্রতিকার কল্পনা করিতেছেন। কিন্তু এই ব্যবহারের উচ্ছেদ দূরে থাক্, ইহা ক্রমশঃ ব্যাপক হইতেছে। পূর্বে যে শ্রেণীতে ছিল না, এখন সে শ্রেণীতে অল্প অল্প দেখা দিতেছে; পূর্বে যে কন্যার পিতা ইংরেজী-পাশ জামাই খুঁজিতেন না এখন তিনি খুঁজিতেছেন। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যেমন জামা-জোড়ার চলন বাড়িতেছে, ইংরেজী-শিক্ষিত বরের পণও চড়িতেছে। উৎকল ও বিহারে বরপণ ছিল না, বঙ্গের মতন ছিল না, এখন সে সে প্রদেশেও আরম্ভ হইয়াছে।

বরপণ যোগাইতে গিয়া অনেক কন্যার পিতাকে কষ্টে পড়িতে হইয়াছে, ধনাঢ্য ব্যতীত অন্যের পক্ষে ত্রাসের কারণ হইয়াছে। সে বৎসর পিতাকে সর্বস্বান্ত হইতে দেখিয়া তাঁহার বুদ্ধিমতী কন্যা স্নেহলতা আত্মহত্যা করিয়া পিতার দুশ্চিন্তা দূর করে। তাহার এই শোচনীয় মৃত্যুর পর কলিকাতায় কাগজে, মজলিশে, বক্তৃতা-মঞ্চে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। যুবকদিগকে মাতাইয়া বরপণ উঠাইয়া দেওয়ার বহু চেষ্টা চলিয়াছিল। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, স্নেহলতার আত্মহত্যায় সমাজ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল।

যুবারা কিন্তু সে উত্তেজনা ভুলিয়া গিয়াছে। বরপণ যেমন ছিল, তেমনই আছে। আজিকালিকার বিলাসিতার এবং মহার্ঘতার দিনে বিবাহ-যোগ্যা কন্যার পিতার কষ্ট যুবাদিগের মনে প্রবেশ করিতেছে না। কারণ অন্যের ক্লেশ হইবে বলিয়া আমি অর্থ লইব না অর্থাৎ অন্যের হিতসাধন আমার কর্তব্য হইলে আমাকে প্রায় উপবাসে থাকিতে হয়। এমন কে আছে যে নিজের স্বার্থ না দেখিয়া কেবল পরের স্বার্থ দেখিতে থাকিবে। আর,

স্বার্থপর না হইলে সমাজই বা চলিবে কিসে? দুই দশজনের উদারতা কিংবা ত্যাগিতা দ্বারা সামাজিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না।

কেহ বলেন, আমি কন্যাদায়গ্রস্ত; দায় হইতে মুক্ত করিয়া আমার জাতি-কুল রক্ষা করুন। বরের পিতা বলেন, দায় তোমার, এবং তোমার মতন দায় অনেকের আছে। অন্যকে দায়মুক্ত না করিয়া তোমাকেই কেন করিব?

লাভের পথ থাকিলে যুক্তির অভাব হয় না। এমন কে আছে, যে যুক্তির অভাবে অর্থ-গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়াছে? পথের দস্যু যখন হতভাগ্য পথিকের মস্তকে স্থূল লগুড় নিক্ষেপ করে, তখন সে বিনাযুক্তিতে পথিকের প্রাণ হরণ করে না। ফলতঃ যাঁহারা দয়া-দাক্ষিণ্যের গুণ কীর্তন করিয়া কিংবা যুক্তিজালে বরকর্তাকে বদ্ধ করিয়া বরপণ রহিত করিতে প্রয়াসী তাহাঁরা মানব-প্রকৃতি অবগত নহেন, কিংবা সে প্রকৃতিকে ফাঁকি দিয়া কর্মসিদ্ধির দুরাকাঙ্ক্ষায় মুগ্ধ হন।

বরপণ-গ্রহণের একটা নূতন যুক্তি এই যে পুত্রের লেখাপড়ায়, তাহাকে মানুষ করায় বহু অর্থব্যয় হয়; কিন্তু কন্যাকে মানুষ করিতে কিছুই লাগে না। পুত্র কন্যা একই পদার্থ, উভয়কে সমান চক্ষে দেখা উচিত। অতএব পুত্র হইলে যে অর্থব্যয় হইত, কন্যাতে সেই অর্থব্যয় কর। তা ছাড়া, বিবাহিত পুত্র বধূর সুখ-স্বচ্ছন্দতা দেখে, ভরণ-পোষণের ভার লয়। বধূর পিতাকে কিছুই করিতে হয় না। সুতরাং জামাতার নিমিত্ত যে অর্থব্যয় তাহার ফলভাগী কেবল সে নহে, অপরের কন্যাও হয়। পিতার বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পুত্র হয়, কন্যা হয় না। সে কন্যার সুখবিধানের নিমিত্ত বিষয়-সম্পত্তির কিয়দংশ বরকে দান অকর্তব্য কি?

কন্যার পিতামাতা উত্তমকুলজাত বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন সুশীল ও ধনবান্ জামাই আকাঙ্ক্ষা করেন; ইহা স্বাভাবিক। একটা সংস্কৃত শ্লোকে আছে, কন্যা বরের রূপ, মাতা বিত্ত, পিতা বিদ্যা, বন্ধুজন (আজিকালির ভাষায়

কুটুম্ব) কুল, এবং অপরে মিষ্টান্ন চায়। এরূপ জামাই জোটা বহু ভাগ্যের ফল। ইহার নিমিত্ত অর্থব্যয় অপব্যয় নহে।

আমরা পুত্রের শিক্ষা ও শীলতার প্রতি যত মনোযোগী কন্যার শিক্ষার প্রতি তত নই। ফলে যোগ্য পাত্র যত মেলে, যোগ্যা পাত্রী তত মেলে না। ইহার উপর পাত্রী যদি তেমন সুরূপা না হয়, তাহা হইলে বিবাহ-সম্বন্ধ দুর্ঘট হইয়া উঠে। এখন টাকার তোড়া দেখাইয়া বরের পিতাকে ভুলাইতেছি। বরপণ না থাকিলে এরূপ কন্যার গুণান্বিত বর পাওয়া যাইত না। অতএব সমাজে বরপণের আবশ্যকতাও আছে।

কিন্তু বরপণের প্রকৃত অর্থ, বর বিক্রেয় বস্তু। বরের পিতা বিক্রেতা, কন্যার পিতা ক্রেতা। পণ শব্দের অর্থে মূল্য; বরপণ,— বরের মূল্য। বরের হাটে বিক্রেয় বর একটী আছে; ক্রেতা বহু। এস্থলে বরের মূল্য না বাড়িয়া পারে কি? সেকাল হইলে হয় ত কাড়াকাড়ি মারামারি ঘটিত। একালে টাকায় সে রক্তারক্তি নিবারণ করিয়া সমাজে শান্তি আনিয়াছে।

পূর্বকালে এক বরের বহু পত্নী থাকিতে পারিত। ক্রেতার মধ্যে বর-কাড়াকাড়ির প্রয়োজন হইত না। এখন সে দিন গিয়াছে। যত কন্যা, তত বর চাই। কাজেই কন্যার বিবাহ দেওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছে।

অতএব ক্রয়-বিক্রয়ের স্বাভাবিক ধারা যুক্তিতর্কে পরিবর্তিত হইবার নহে। দুর্ভিক্ষের সময় চাউলের মহাজন লাভের পথ দেখে, লোকে অন্ন বিনা মরিতেছে কিনা, মনেও ভাবে না। পুত্রের বিবাহে যদি চাহিলেই টাকা আসে, এমন নির্বোধ কে আছে যে, সে টাকা পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবে? যদি আইন হয় যে বরের বাপ বরের দাম লইতে পারিবে না, দাম চাহিলে রাজদ্বারে দণ্ড পাইবে, তাহা হইলেও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপার ঘুচিবে না। তখন সেয়ানার দল বাড়িবে। সেয়ানার দল এখনও আছে। ইহারা বরের দাম কষাকষি না করিয়া কন্যার ধনবান্ পিতার কর্তব্যের উপর নির্ভর

করে। যেখানে প্রাপ্তির আশা বিলক্ষণ না থাকে, সেখানে মাড়ায় না। আইন হইলে পণ নাম ঘুচিবে ; কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় চলিতে থাকিবে।

ইতিমধ্যে একটা কুফলও ফলিতেছে। যিনি পণ গ্রহণ না করিয়া শিক্ষিত পুত্রের বিবাহ দিতেছেন, তিনি স্বয়ং না হউন, তাহাঁর আত্মীয় স্বজন কাগজে কলমে ঢাকঢোল পিটিয়া গগন ফাটাইতেছেন। "অমুকের বিবাহে বরপণ চাওয়া বা লওয়া হয় নাই।" পূর্বকালে আত্মশ্লাঘা ও আত্মহত্যা সমান বিবেচিত হইত। এখন দানধর্ম ও পুণ্যকর্ম কদাচিৎ গোপনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অত কথায় কাজ কি, যেখানে দানপুণ্য কিছুই নাই, গ্রন্থ ছাপাইয়া গ্রন্থকার নিজের প্রতিমূর্তি জুড়িয়া আত্মঘোষণা করিতেছেন। এমন কালে বরপণ কেহ উঠাইয়া দিতে পারে কি ?

ইয়ুরোপের সভ্যতা যেটা আমাদের চোখে নিত্য প্রতিভাত হইতেছে, সেটা ভোগের সভ্যতা। এই সভ্যতা আমাদের সমাজ-দেহের মর্মে মর্মে প্রবেশ করিতেছে। বিভব-প্রদর্শন ইহার বাহ্য বিকাশ। আমরা জনে জনে মনে করি, এক এক রাজা। রাজার পক্ষে যাহা সাজে কিংবা সহজে জোটে, আমরাও তাহা চাই। আমরা পুত্রের বিবাহে স্বর্গের অপ্সরা চাই, সুবর্ণে ও রত্নে আপাদ-মস্তক-মণ্ডিতা চাই, পুষ্পক রথও একটা চাই ; সঙ্গে সঙ্গে টাকাও চাই, নচেৎ রাজ-ভোগ চলে না। বরপণ-যোগে বিবাহে ঘটা হইতেছে। জাঁকে বিবাহ-হেতু বরপণ বাড়িতেছে। নিত্য আচার-ব্যবহারে জাঁক ; বিবাহে জাঁক আর আশ্চর্য কি ?

যে বরকর্তা বলেন, "আমি দরিদ্র তুমি ধনী, তোমার কন্যার ভরণ-পোষণের নিমিত্ত কিছু অর্থ স্থাপন কর", তাহাঁকে শ্রদ্ধা করি। কারণ এই অর্থ বরপণ নহে, যৌতুক ; ইহার অপর নাম স্ত্রী-ধন। পূর্বকালে যৌতুক দিবার বিধি ছিল। হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য সমাজেও এই বিধি অল্পাধিক আছে। কিন্তু যখন বরকর্তা বলেন, আমি বরের পিতা, আমাকে

দেও, বরের প্রাপ্য পণ দেও, বরকে হীরা-মাণিকের আভরণ দেও, তখন তিনি পুত্র-বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ উপার্জন করিতে বসেন। সেই সত্যযুগে গৃহস্থেরা সোনার থালে খাইয়া হীরার খাটে শুইতেন কিনা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু আজিকালি বিশ-ত্রিশ টাকা বেতনের চাকরিয়ার বুকের উপরে সোনার ঘড়ী ও চেন ঝুলিতে থাকে; সে সোনা-দানা স্ব-উপার্জিত নয়, শ্বশুর-দত্ত। বাস্তুভিটা টুকুও হয় ত নাই, কিন্তু বধূর গায়ে হাজার টাকার অষ্ট অলঙ্কার। এই অলঙ্কার বস্তুতঃ যৌতুক, কিন্তু আদায়ে বরপণের অন্তর্গত। শোনা গিয়াছে বিবাহের লগ্ন বহিয়া যায়, বরকর্তা পণের টাকা একটী একটী করিয়া বাজাইতেছেন! এমনও শোনা গিয়াছে, লগ্ন-সময়ে বরকর্তা সেকরা লইয়া অলঙ্কার ওজন করিতেছেন!

কিন্তু এইখানেই বরপক্ষের দস্যুবৃত্তি শেষ হয় না। কন্যা শ্বশুর-বাড়ী গেলে বরকর্ত্রী পালা আরম্ভ করেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কোনও গহনা ভাল নয়, তত্ত্বের সন্দেশ পাড়াপড়শীকে দিতে কুলায় না, ইত্যাদি। শাশুড়ীর প্রথম গর্জন, বধূকে পিত্রালয়ে যাইতে দিবেন না। দ্বিতীয় গর্জন, তিনি পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহ দিবেন। কিন্তু এই সব বিচার ও আলোচনা এবং গঞ্জনায় বালিকাবধূর শ্বশুর-ঘর করা সন্তাপ-গৃহবাস তুল্য হয়। যে বর নবোঢ়া বধূর এইরূপ দুঃসহ কষ্টের কারণ হয়, যে স্বীয় পত্নীকে রক্ষা করিতে পারে না, সে নিশ্চয়ই মূঢ় এবং বর হইবার অযোগ্য।

বর্তমান অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। কন্যার বয়স ৯।১০ বৎসর হইতে পিতা কিংবা ঘটক এখানে ওখানে বর খুঁজিয়া বেড়ান। কোনও প্রাণী কোনও উদ্ভিদ সমাজে বর-খোঁজা আছে কি? কন্যার অন্বেষণে বর ফেরে, বরের অন্বেষণে কন্যা ফেরে না কিংবা দূত পাঠায় না। এমনও দেখি কন্যার পিতা কন্যাকে লইয়া এখানে ওখানে গিয়া ভাবী বরের পিতা ভ্রাতা প্রভৃতিকে দেখাইয়া বেড়ান; যেন কন্যা বিক্রেয় দ্রব্য! কন্যার

বিবাহ বড়, না কন্যাত্বের গৌরব বড়? এ কথা সে হতভাগ্য পিতার মনে উঠে না। কন্যার মানরক্ষা যদি পিতা না করিলেন, কে আর করিবে? এই কারণে সমাজের ব্যবস্থা কন্যা কদাপি পিতৃগৃহ হইতে অন্যত্র গিয়া নিজেকে দেখাইবে না। কোন কোন মূঢ় বরকর্তা কন্যার পিতাকে কন্যা বহিয়া লইয়া দেখাইতে বলেন। সে বোঝে না, যে কন্যাকে ঘরের লক্ষ্মী করিয়া আনিতে যাইতেছে, প্রথমেই যে তাহাকে অপমান করিতে পারে, সে শ্বশুর হইবার অযোগ্য। ইহাতেও তৃপ্ত নয়; কন্যাকে বর গ্রহণ করিবে, এই দয়ার বিনিময়ে টাকা চাহিতে সাহসী হয়! বালিকা-কন্যা বরপণের অর্থ বুঝিতে পারে না। মনে করে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু বয়সে বুঝিতে পারে, তাহার প্রার্থী কেহ ছিল না, পিতামাতা বরের পিতাকে টাকার দ্বারা বশীভূত করিয়া বরের হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন। তখন সে স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি ভক্তিহীনা হয়, এবং নিজের অপদার্থ জীবনে ধিক্কার দেয়। যে বিধিতে নারীত্বের গৌরব খর্ব হয়, সে বিধি অবিধি, সাংসারিক অশান্তির হেতু।

দানে পুণ্য, এ কথা সকল ধর্মেই আছে। হিন্দুধর্ম বলে, দানের মধ্যে কন্যাদান শ্রেষ্ঠ। ইহা যে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্বে সন্দেহ না থাকিলে যাহাতে সে আশ্রমের স্থিতি, তাহাতে সন্দেহ আসিতে পারে না। পরাক্রম দ্বারা বিবাহযোগ্যা কন্যা লাভ হইতে পারে। কিন্তু তাহা রাক্ষস-সমাজে, মানব-সমাজে নয়। আমাদের সমাজে কন্যার পিতা কন্যাদান না করিলে, বিবাহ হইতে পারে না। রূপবতী গুণবতী সুশীলা সালঙ্কৃতা কন্যাদানই দান। যে দ্রব্যের আদর নাই, তাহার দানে পুণ্যও নাই, কারণ তাহা সুলভ। কন্যার প্রতি আদর-মমতা পিতামাতার যেমন, অন্যের তেমন নহে। পিতা সে মমতা ত্যাগ করিতে পারিলেও মাতা পারেন না। কন্যা যে মাতৃ-স্বরূপা; সে যে মেয়ে। এমন মেয়েকে যথাসাধ্য সালঙ্কৃতা না করিয়া কোন মাতা পরের ঘরে যাইতে

দিতে পারেন না। কারণ কন্যা নিরাভরণা গেলে মাতার সম্মান লাঘব হয়। শ্বশুর-ঘরে কন্যাকে দুর্বাক্য বা অনাদর সহিতে হইবে, এই আশঙ্কা নহে; কন্যা আদরের যোগ্যা বলিয়াই কন্যাকে মাতা সাজাইয়া পাঠান। মায়ের বাড়ীতে ঝী স্বচ্ছন্দে কুবেশে থাকিতে পারে; কিন্তু শ্বশুরঘরে লক্ষ্মী-স্বরূপা হইতে হইবে; সেখানে অলক্ষ্মীর বেশ কিছুতেই সাজে না। সাজা-না-সাজা মুখের কথা নয়; মাতৃত্বের কথা। কুৎসিতবেশা নিরাভরণা কন্যাদান অসম্ভব।

ঠিক এই কারণে কন্যাকে যৌতুক দিতে হয়। অন্যের ঘরে যাহাকে জানি না, তাহার ঘরে যে গৃহলক্ষ্মী হইতে যাইতেছে, তাহাকে গৃহস্থের যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্য নিশ্চয়ই চাই। এই যে দ্রব্যসম্ভার যাহা পিত্রালয় হইতে কন্যা লইয়া যায়, তাহাতে তাহারই অধিকার, শ্বশুরালয়ের কাহারও নহে। অতএব ইহা যৌতুক। কন্যার অলঙ্কার যেমন যৌতুক, অপর দানসামগ্রী যেমন যৌতুক, যাহা বরপণ নামে দান বা উৎসর্গ করা হয়, তাহাও তেমন যৌতুক মনে করিতে পারিলে বরপণের অত্যাচার থাকিত না। কন্যার সংসারযাত্রার সম্বলের নাম যৌতুক। কন্যাকে যৌতুকদান হিন্দুধর্মে প্রসিদ্ধ আছে।

বাধা এই, বরের পিতা পণ বলিয়া গ্রহণ করেন, যৌতুক স্বীকার করেন না। পণের টাকা তাঁহার। মূলে বরের; কিন্তু বর পায় না, পিতা আত্মসাৎ করেন, আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করেন; হয় ত স্বীয় কন্যার বিবাহের ব্যয় পুত্রের পণ হইতে নির্বাহ করেন। এইটাই কু। বরের পণ, না বরের পিতার পণ? বর ধনুক-ভাঙ্গা পণ করিতে পারে, কিন্তু সে পণে পিতার অধিকার কোথায়? পিতা পুত্রের বিবাহ নির্বাহ করিবেন; না করিলে তাঁহার ধর্মহানি হইবে, বংশের পিণ্ড লুপ্ত হইবে। পুত্রের গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের পূর্বে যত কিছু কার্য, পিতার কার্য, পিতার কর্তব্য। খাওয়াইতে

পরাইতে ঋণ করিতে হয়, পিতা করিবেন; বিবাহে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দ্বারা জ্ঞাতি-কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধবকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইতে হয়, তিনি করাইবেন। ইহার নিমিত্ত ঋণ করিতে হয়, ঋণের দায় তাহাঁর, কদাপি পুত্রের নহে। কারণ বিবাহের ঘটায় তাহাঁর সন্তোষ, তাহাঁর খ্যাতি; পুত্রের নহে। এস্থলে যে পিতা পুত্রের অর্জিত পণ আত্মসাৎ করেন, তিনি পিতৃধর্মে বঞ্চিত। তাহাঁকে কুপিতা বলিতে পারা যায়।

তিনি কুপিতা; কারণ তিনি পুত্রকে বিক্রেয় দ্রব্য মনে করেন। তিনি পুত্রের ভক্তি-প্রীতি-মর্যাদা রক্ষা করেন না। তাহাঁর ইচ্ছায় পুত্র বিবাহ করে, পুত্রের কর্তব্য তাই। কিন্তু সে পিতা নিজের ধর্ম পালন করেন না; তিনি অধার্মিক। পুত্রের অর্জিত ধনে পিতার অধিকার আদৌ নাই, থাকিতে পারে না।

কন্যার পিতা কন্যাদান করেন; বর সে দান গ্রহণ করে, বরের পিতা করেন না। পিতৃহীন বরের বিবাহ হয়। কন্যার পিতা বর্তমান না থাকিলে কন্যার মাতা কিংবা অন্য অভিভাবক কন্যাদান করিতে পারেন। অতএব দান, দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে বরের পিতার স্থান নাই। তথাপি তিনি যে বরপণ আদায় করেন, সেটা তাহাঁর দালালি; পুত্র-সম্বন্ধে, দালালি পিতার গর্হিত।

কন্যার পিতা উপবাসী ও শুচি হইয়া পিতৃপিতামহাদির শ্রাদ্ধ করিয়া নারায়ণ সাক্ষী রাখিয়া বরকে কন্যাদান করেন; এমন দান করেন যে কন্যার আলয়ে গিয়া দান-প্রতিগ্রহের আশঙ্কায় অন্ন পর্যন্ত স্পর্শ করেন না। বরও শুচি হইয়া নারায়ণ সাক্ষী করিয়া কন্যাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করে। দাতা বড়, না গ্রহীতা বড়? নিশ্চয়ই গ্রহীতা বড়। যে-সে ভাল মন্দ দান করিতে পারে। কিন্তু যে-সে গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব "হে বর, হে শ্রেষ্ঠ, হে বরেণ্য, তুমি কন্যা গ্রহণ করিয়া তাহার পিতাকে চরিতার্থ কর, তুমি তাহাঁর ধর্ম প্রতিপালনের সহায়; তুমি পূজ্য, উদার-

চরিত, তোমায় নমস্কার।" এ হেন বর যাহাকে কন্যা বরণ করিয়াছে, তাহাকে অদেয় কি আছে? কন্যার সহিত আরও কিছু প্রার্থনা করিলে কন্যার পিতার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। যাহাঁর গৃহে অতিথি উপস্থিত হয়, তিনি যেমন শ্লাঘ্য, অতিথিও তেমন পূজার্হ। অতিথি পূজা গ্রহণ করিয়া গৃহীকে ধন্য করেন; কন্যা গ্রহণ করিয়া কন্যার পিতাকে বর তেমনই ধন্য করেন। অতিথি এক দিনের; কন্যার পতি নববধূকে চিরদিনের তরে পত্নীত্বে বরণ করেন।

বড় কে? দাতা না গ্রহীতা? লোকে ব্যাপারটা তলাইয়া বোঝে না। বুঝিলে দেখিত, কন্যা ব্যতীত অর্থ প্রার্থনা করিয়া বর নিজেকে কতখানি অপদস্থ করে। অতিথি কি কিছু চাহিতে পারে? যাহাঁর আত্মমান আছে, তিনি কি তাহা সহজে খর্ব করিতে পারেন? আর, যাহাঁর সে জ্ঞান নাই, তিনি অতিথি নন, বরও নন। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে কে বড় তাহা বলা অসাধ্য।

এ হেন সম্বন্ধকে বরের অধার্মিক পিতা বুঝিতে পারিবেন কি? তিনি পুত্রের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করেন কি? বধূকে যে পুত্র অর্ধাঙ্গিনী করিতে চায়, যাহাকে তাহার অদেয় কিছু নাই, সুখে দুঃখে যে চিরসঙ্গিনী, যে কর্মে বধূর মনে কষ্ট হইতে পারে, সে কি সে কর্ম করিতে পারে? স্বীয় পিতা-মাতার অপমানে যেমন দুঃখ, পিতৃ-মাতৃ তুল্য শ্বশুর-শাশুড়ীর অপমানেও বরের তেমন দুঃখ। যদি দুঃখ বোধ না করে, তাহা হইলে সে পতি হইতে পারে নাই। পতিত্ব-স্বীকার কি যেমন তেমন কর্ম? আর পত্নীত্ব-স্বীকারই কি যেমন তেমন কর্ম? স্বামী বড়, না জায়া বড়? এ প্রশ্নের উত্তর নাই।

কথাটা যদি এমন, তবে যুবারা, শিক্ষিত যুবারা, পণ গ্রহণে আপত্তি করে না কেন?

ইহার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে একটা প্রধান। মানুষে দেবত্বের বিকাশ হইয়াছে, কিন্তু পশুত্ব একেবারে লুপ্ত হয় নাই। লুপ্ত হইতে পারে না; কারণ লুপ্ত হইলে মানুষ-সৃষ্টিও লুপ্ত হইবে। পশু-সমাজে দ্বিবিধ বিবাহ দেখা যায়; কন্যা স্বয়ংবরা হয়, কিংবা বর বলপূর্বক কন্যা হরণ করে। বলপূর্বক কন্যা বিবাহ রাক্ষস বিবাহ। রাক্ষস সমাজে এই বিবাহ ছিল। ইহা বীরোচিত বিবাহ; দয়াদাক্ষিণ্যহীন মনুষ্য সমাজে অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হইতেছে। যেখানে কন্যা স্বয়ং পতি বরণ করে, যেখানে 'বরং বরয়তে কন্যা', সেখানে প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। কারণ কন্যা স্বয়ংবরা হইলে কাপুরুষের বিবাহ অসম্ভব হয়; কদাকার গুণহীন মূর্খের, বিকলাঙ্গের, রুগ্নের, বিবাহও অসম্ভব হয়। ইয়ুরোপে কন্যা স্বয়ংবরা হয়; সে দেশে সৈনিক বীরের বিবাহ সহজে সম্পন্ন হয়। আমাদের দেশে কন্যা স্বয়ংবরা হয় না, বীরেরও সমাচার পাওয়া যায় না। কিন্তু তা বলিয়া বিবাহের আদিম ভাব লুপ্তও হয় নাই। ইহারই একটা বিকাশ কন্যার পিতার নিকট বরের পণ প্রার্থনা। যে সে পণ চাহিতে পারে না। শৌর্য বীর্য যাহার আছে, সেই পারে। অকৃতি অধমকে কন্যা ক্রয় করিতে হয়; কৃতীকে কন্যাসহ অর্থদ্বারা তুষ্ট করিতে হয়।

কথাটা আর একটু বিস্তৃত করা যাউক। যৌবনকাল বিবাহের কাল। কত বয়স পর্যন্ত যৌবন, সে বিচারে কাজ নাই। যৌবনের বহু দোষ ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু বহু গুণও আছে। যৌবনের বিকাশে মানুষ নিজেকে অনুভব করিতে আরম্ভ করে। আত্মপ্রকাশ ইহার প্রধান লক্ষণ। তখন বাহ্য প্রকৃতির সহিত বোঝাপড়া সুরু হয়। মনে কবিত্ব আসে, ধর্মজ্ঞান প্রখর হয়, উৎসাহ ও তেজ চোখে ফুটিতে থাকে। যুবার তুল্য সদাশয়, প্রেমিক, ত্যাগী, ও বীর আর নাই।

এমন যুবা যে পরের তরে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে, সে ভাবী শ্বশুর

পীড়ন করিয়া পণ আদায় করিতে পারে কি? সে নব বধূর খেদের কারণ হইতে পারে কি? যদি না পারে, তবে পণের নামে বাঁকিয়া বসে না কেন? বিবাহের পূর্বে মাতাকে বলে না কেন? স্নেহলতার আত্মহত্যা তাহার মনে জাগে না কেন?

ইহার অনেক কারণ মনে হইতে পারে। যুবা গুরুজনকে ভক্তি করে; তাঁহাদের ইচ্ছার বিপরীত কিছু করিতে কিংবা বলিতে পারে না। নিজের বিবাহের কথায় লজ্জাবোধ করে; কারণ সে যুবা, অবিবাহিত। কেহ কেহ বরপণ লইতে দেখিয়া উহার দোষ উপলব্ধি করিতে পারে না। কেহ হয় ত নিজের ভগিনীর বিবাহে অত্যাচার সহিয়াছে, এখন প্রতিশোধের সুযোগ ছাড়িতে পারে না। হয় ত সংসার সচ্ছল নহে, উপস্থিত অর্থ ত্যাগও করিতে পারে না। আর ইহাও সত্য, যুবা হইলেই যৌবনোচিত ধর্ম সকলের থাকে না।

কিন্তু এসব বাহ্য কারণ। এক গূঢ় কারণ আছে। যুবা সংসারের গণনায় উদার-চেতা, করুণ-হৃদয়, পৌরুষ বটে; কিন্তু যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠার বাধা হয় সেখানে নহে। যৌবনের ধর্মই এই। সে যে এত পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে; গর্ব একটু আসিবে বই কি! তাহাকে যে বরণ করিতে চাহিতেছে, কন্যা লইতে টাকা লইতে সাধিতেছে; সাধিবার কথাই ত বটে। তাহার তুল্য যোগ্য বর আর কে আছে? শ্বশুর-টশুর কে জানে; ইনি তাহার গৌরব না বোঝেন, উনি বুঝিবেন। যুবা আত্মাভিমানী। মিথ্যা হউক, সত্য হউক অপমানের লেশ সহিতে পারে না। কারণ সে যুবা; সে-ই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ রাজা, প্রকৃতির দ্বারা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত।

যুবার কৃতকর্মের বিচারের সময় বৃদ্ধ মনে করেন, সে তাঁহার তুল্য বৃদ্ধ, শিষ্ট, শান্ত। তাঁহার তিতিক্ষা আছে, যুবার না থাকা দোষ। সে বৃদ্ধ কিন্তু বিজ্ঞ নহেন, নিজের যৌবন দশা ভুলিয়া গিয়াছেন। বালক চঞ্চল, যুবা

দুর্দান্ত, প্রৌঢ় সংযত, বৃদ্ধ শ্লথ,—প্রকৃতির নিয়তিই এই; নতুবা সৃষ্টি থাকিতে পারিত না।

বিজ্ঞ জানেন, যুবাকে দুর্দান্ত রাখিলে তাহার অহিত হইবে। মহাবেগ ও প্রচণ্ডতা, কুত্রাপি হিতকর নহে। যৌবনের প্রাবল্য দমন কর্তব্য। সেকালের যুবাকে 'কায়েন মনসা বাচা' ব্রহ্মচারী করিয়া রাখা হইত। ব্রহ্মচর্যের পর দারপরিগ্রহ। তখন যৌবনের আত্মাভিমান নাই; আত্মকাম দশা অতীত হইয়া পরকাম দশার উদয় হইয়াছে, শাস্ত্রে কন্যাদানের ও বধূগ্রহণের তাৎপর্য স্পষ্ট হইয়াছে।

একালে ঘরে বাহিরে কত অলক্ষিত সামাজিক রীতি যৌবনকে সংযত করিতেছে। যে যুবা কলেজে ঢুকিয়াছে, সে অদৃশ্য সূত্রজালে বদ্ধ হইয়া দুর্দান্ত অশ্ব যেমন শিক্ষিত হয়, তেমন সংযতগতি হইতেছে। কিন্তু এই বর্তমান ইংরেজী শিক্ষার একটা মহৎ দোষ এই যে ইহা মনের কর্ষ করিয়া ছাড়িয়া দেয়, সৎবীজ বপন করে না। বন ভাঙ্গিয়া আবাদ করে, কিন্তু কিসে সোনা ফলিবে, তাহার উপদেশ করে না। বুদ্ধি মার্জিত হয়, কিন্তু ধর্মাধর্ম-জ্ঞান-উন্মেষের চেষ্টা করা হয় না। যুবা সব শেখে, শেখে না গৃহী হইতে। ইহাতেও যে যুবারা এক রকম মানুষ হইতেছে, ইহা পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল।

এমন অবস্থায় যুবাদিগের দ্বারা সামাজিক সমস্যার কি সমাধান হইতে পারে? যুবা হইলেও বালক, যাহার বুদ্ধি স্থির হয় নাই, ধর্মাধর্মবিনিশ্চয়ে দৃঢ় হয় নাই। বিবাহ করে, কিন্তু চোখ-কান বুজিয়া করে; কি করিতেছে কেন করিতেছে তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া করে। একটা অস্পষ্ট আব্-ছায়া মনে ভাসিতে থাকে; একটা স্বপ্নরাজ্য কল্পনা করে, যেটা দুই দিনের জাগরণে অদৃশ্য হয়।

বস্তুতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রবৃত্তির বিরোধে সমাজ-দেহ ক্ষতবিক্ষত

হইতেছে। এক স্থানে নহে, দুই স্থানে নহে। যাহার বহু স্থানে ক্ষত সে ত আর্তনাদ করিবেই। কন্যার পিতাকে উৎপীড়িত করিয়া মনে করিতেছি কুলধর্ম রক্ষা করিলাম; ধনেই কুলীন হইতেছি; নবধা কুল-লক্ষণ অস্বীকার করিতেছি; সহস্র বিষয়ে অহিন্দুর কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া হিন্দু ও আর্য নামের ধ্বজা উড়াইতেছি। কাহার সাধ্য, এই স্রোত প্রতিরোধ করে? যাহার মূলে ভোগলালসা, স্কন্ধে অর্থনীতি, শাখায় বিভব-প্রদর্শন তাহার ফলেও নিঃসার কিন্তু স্ফীত পীতবর্ণ বিলাতী কুষ্মাণ্ডই হইবে।

হিন্দু সমাজে বিবাহ একটা সংস্কার অর্থাৎ শুদ্ধি। কোন্ কন্যার কি বর আবশ্যক, তাহা প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বিচার করিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত পুরুষ ও নারী পরীক্ষার প্রয়োজন হইয়াছিল। বিবাহে জ্যোতিষিক গণনার প্রয়োজনও এই কারণে হইয়াছিল। এই গণনার দ্বারা বরকন্যার দাম্পত্য দশা, সুখসৌভাগ্য ঈপ্সিত হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দু সমাজের সকল শ্রেণীতে একই ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। কালে কালে উহার পরিবর্তন হইয়াছিল। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ, এই আট প্রকার বিবাহ ছিল। এই আটের মধ্যে প্রথম চারিতে কন্যাদান, আসুর বিবাহে কন্যা ক্রয় হইত, গান্ধর্বে দানাদান ক্রয়বিক্রয় ছিল না, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহে বলপূর্বক কন্যাহরণ হইত। সমাজের কোন্ শ্রেণীতে কি বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা এই সকল নাম হইতে অনুমান করিতে পারা যায়। ব্রহ্মবাদীকে প্রসন্ন করিয়া যথাশক্তি অলঙ্কারসহ কন্যাদান ব্রাহ্ম বিবাহ; যজ্ঞের ঋত্বিক্‌কে কন্যাদান দৈব; গো বিনিময়ে ঋষিকে কন্যাদান আর্ষ; স্বামীর সহিত ধর্মাচরণ করিবার নিমিত্ত সালঙ্কৃতা কন্যাদান প্রাজাপত্য; কন্যার পিতা ও জ্ঞাতিজনকে অর্থ দিয়া কন্যা-গ্রহণ আসুর; কন্যা ও বরের ইচ্ছা-ক্রমে বিবাহ গান্ধর্ব; কন্যা-পক্ষকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বলপূর্বক কন্যাহরণ রাক্ষস; সুপ্ত মত্ত কন্যা ছলে হরণ পৈশাচ। পৈশাচ বিবাহ

সকলের অধম বিবেচিত হইত। রুক্মিণী হরণে রাক্ষস বিবাহের উদাহরণ পাই। গান্ধর্ব বিবাহ দুষ্য ছিল না, বরং বহুকাল পর্যন্ত এই বিবাহ উত্তম বিবেচিত হইত। দুষ্য হইলে ঋষি ও ঋষিকন্যাগণ শকুন্তলার বিবাহ অনুমোদন করিতেন না। স্বয়ংবর বিবাহ গান্ধর্ব বিবাহের অন্তর্গত। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে প্রাজাপত্য বিবাহ নির্দিষ্ট ছিল, এবং এই বিবাহ বর্তমান সমাজে চলিতেছে। প্রজা সৃষ্টি করেন বলিয়া নাম প্রজাপতি। প্রজা, সুপ্রজা দ্বারা সমাজের স্থিতি। অতএব যদ্দ্বারা সুপুত্র লাভ হইতে পারে, তাহা প্রজাপতির নির্বন্ধ।

প্রাজাপত্য বিবাহ চলিতেছে বটে; কিন্তু বিবাহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এখনও আদি মানবসমাজের রাক্ষস বিবাহের লক্ষণ বিদ্যমান আছে। বরপক্ষ দলবলে কন্যার গৃহে উপস্থিত হন। মাঙ্গল্য কর্মে বাদ্য-ভাণ্ড বুঝিতে পারি, কিন্তু বরযাত্রীর সঙ্গে লাঠি-খেলআড় কেন থাকে, কেনই বা বর ও কন্যা পক্ষের মধ্যে কলহ হয়? সবাই জানে কন্যা-কর্তা কন্যাদান করিবেন, অথচ বীরত্ব ও বৈরিতা প্রকাশ ব্যতীত বিবাহ হয় না। বিবাহের এক নাম পাণিগ্রহণ, পাণি-পীড়ন। বিবাহ, উদ্‌বাহ শব্দেও বলপূর্বক অপহরণের আভাস আছে। বরের সঙ্গে যাঁতি থাকে, কোন কোন বরের তরবারীও থাকে। বর কি যুদ্ধ করিতে যায়? বিবাহের পরে গাঁটছড়া বাঁধে, পাছে কন্যা পলায়ন করে। ইহাতেও বরের মন নিশ্চিন্ত হয় না, কন্যার হাত দোড়ী দিয়া বাঁধিয়া থাকে (সূতাবাঁধা)। দোড়ী অধিক দিন টেকে না। দোড়ীর অনুকরণে হাতে যউ নির্মিত কড়, এবং লোহার বালা। আধুনিক নব্যা নারী লোহার উপরে সোনা চড়াইয়া মনে করেন, তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধা নহেন। কিন্তু ভুলিয়া যান, হাতের লোহাই তাঁহার আয়তির লক্ষণ, এবং শৃঙ্খল সোনার কিংবা শাঁখার হইলেও শৃঙ্খল মাত্র।

সর্বাপেক্ষা অধিক রহস্য, বরকন্যার ফুলশয্যা, বাসরঘরে বরের সহিত

নারীগণের পরিহাস। বরকন্যার কুসুমশয্যা এবং কন্যার বাসর সজ্জা হইতে বুঝিতেছি, প্রাচীন সমাজে শৈশব ও বাল্যবিবাহ ছিল না কিংবা থাকিলেও তাহা নামে মাত্র ছিল; প্রকৃত বিবাহ, পূর্ণবিবাহ অধিক বয়সে হইত। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র শিশুবিবাহ আছে। কিন্তু, তাহা বাক্‌দান মাত্র, প্রকৃত বিবাহ কন্যার দ্বিরাগমনে সম্পন্ন হয়। বেদের সময়ে শিশু-বিবাহ ছিল না, বালবিবাহও ছিল না। সে সময়ের বহুকাল পরেও ছিল না। রামায়ণ ও মহাভারতে বাল্যবিবাহের দৃষ্টান্ত আছে বটে, তেমন যৌবন বিবাহেরও আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, ভারতবর্ষে বিধর্মী মুসলমান প্রবেশের পর হইতে শিশুবিবাহ ও বালবিবাহ দেশময় প্রচলিত হইয়াছিল।

প্রকৃতি বলিতেছে, পুত্র-কামনা বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। বরকন্যা রূপে ও গুণে ভাল না হইলে সন্তান ভাল হয় না। সমাজ চায় বলবান্ সুঠাম দেহ, বলবান্ পবিত্র মন। অতএব সকল বরের বিবাহ কর্তব্য নয়; সকল কন্যারও নয়। যে রুগ্ন, যে কামন, যে ক্রোধন, যে উচ্চাভিলাষী, তাহার বিবাহ কর্তব্য নয়। কেবল পাশের সংখ্যা দেখিয়া বর-নির্বাচন বাতুলতা। পড়িয়া পড়িয়া যে যুবকের চক্ষু কোটরগত হইয়াছে, অনিয়মে যাহার অন্নপাক-শক্তি লঘু হইয়াছে, যে যৌবনেই বৃদ্ধ হইয়াছে, তাহার বিবাহ অনিষ্টের হেতু।

যে বংশে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ দীর্ঘজীবী ছিলেন, যাঁহাদের প্রশান্ত ললাটমণ্ডল কর্মশীলতার পরিচয়ভূমি হইয়াছে, সে বংশের যুবক বিবাহ করিতে পারে। এইরূপ শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিতে যে উত্তম, উত্তম কন্যা তাহারই প্রাপ্য। ইংরেজীতে বলে, None but the brave deserves the fair—কথাটা সত্য, বিজ্ঞানের অনুমোদিত।

বর-নির্বাচন কঠিন; কন্যানির্বাচন আরও কঠিন। যেমন পাশের সংখ্যা দ্বারা বরের বিবাহযোগ্যতা নিরূপিত হয় না, তেমন কন্যার ফর্সা রঙ্গে তার

শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয় না। দ্রৌপদী কৃষ্ণা ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিতে রাজন্যবর্গের মধ্যে বাহুবল পরীক্ষা হইয়াছিল। যে কন্যা সোনার লতিকার তুল্য কাঞ্চনবর্ণা, কিন্তু সোজা দাঁড়াইতে পারে না, অল্প বাতাসেই নুইয়া পড়ে; যাহার মনে ঘর ছাড়া বাহির প্রবেশ করে না, সে কন্যা ঘরণী হইবার অযোগ্যা। কিছু বয়সের পর দেহ আর বাড়ে না; অনেকের মনও আর বাড়ে না। যে বংশে মন বাড়ে না, সে বংশের পুত্রকন্যা, জামাই ও বউ হইবার যোগ্য নয়। এখানে বরকন্যার দোষগুণের তালিকা তুলিয়া ফল নাই। দুঃখ এই, লোকে সমাজের ভবিষ্যৎ সুপ্রজা চিন্তা করে না। সবাই জানে বিবাহের পূর্বে ঘর ও বর দেখিতে হয়। কিন্তু এই ঘর অর্থে কুলীন মৌলিকের বিচার নহে; ইহার অর্থ আচার-ব্যবহার, বংশ-বিত্ত। সাধারণতঃ, সমান ঘরই ভাল।

প্রকৃতিকে ছাড়িয়া দিলে সমাজে গান্ধর্ব ও স্বয়ংবর বিবাহ শ্রেষ্ঠ হইত। প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌রাজ্যে এই ব্যবস্থাই দেখিতে পাই। কিন্তু প্রকৃতির ব্যবস্থায় কাল অনন্ত। মানুষ এতকাল অপেক্ষা করিতে পারে না। অচিরে ফল পাইবার আশায় সমাজ-ব্যবস্থা প্রণয়ন করে। কোন সমাজ প্রকৃতির বশে চলিতেছে, কোন সমাজ প্রকৃতিকে সংযত করিয়া অভীষ্ট পথ রক্ষা করিতেছে। যে সমাজ সংযমমাত্রা অত্যধিক না করিয়া প্রকৃতির অনুসরণ করে, সেই সমাজই জ্ঞানী।

এই বিচারে প্রাজাপত্যের সহিত গান্ধর্ব বিবাহের সম্মিলন কল্যাণকর বোধ হইতেছে; অর্থাৎ পিতা ও অভিভাবক প্রথমে কন্যার যোগ্য বর অন্বেষণ করিবেন, কন্যা নিজের অভিমত বর বাছিয়া লইবে। বর্তমান সমাজে বর ইচ্ছা করিলে কন্যা নির্বাচন করিতে পারে; কিন্তু নির্বাচনে কন্যার কোন অধিকার নাই। অর্থাৎ দুই পক্ষের এক পক্ষ অধিকার পাইয়াছে, অন্য পক্ষ পায় নাই। যাহাতে কন্যাও বর দেখিতে পায়, তাহার

ব্যবস্থা কর্তব্য হইয়াছে। ইহাতে অন্য ফল যাহাই হউক, একটা এই হইবে যে-সে যুবা পাশ দেখাইলেই, নির্বাচিত হইবে না। তখন যুবামাত্রেই বর সাজিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না, বরের পিতার বিষদাঁত ভাঙিয়া যাইবে।

সামাজিক ব্যাপার অতি শীঘ্র পরিবর্তিত হয় না। কারণ একটার ডাল-পালা অন্য দশটার সঙ্গে জড়াইয়া বাড়িতে থাকে, এবং একটাকে কাটিতে গেলে অন্য দশটায় আঘাত পড়ে। তথাপি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার তুল্য হিন্দু-সমাজেই এক পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। এখন শিক্ষিত সমাজে বালবিবাহ নাই, কিশোর বিবাহও নাই, যুবা বিবাহ চলিতেছে। এমন কি, পাঠ সাঙ্গ করিয়া অর্থোপার্জনে সমর্থ না হইলে যুবা আর বিবাহে সম্মত হইতেছে না। এটা শুভ লক্ষণ। কারণ যে যুবা সংসারের কঠোরতা উপলব্ধি করিয়াছে, ভবের হাটে নিজের দর যাচাই করিয়াছে, সে আর কোন্ মুখে রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজ্য প্রার্থনা করিবে, কোন্ বুদ্ধিতে বাবার দালালি মানিতে পারিবে?

আরও কথা আছে। যে যুবা বিবাহ করিতে টাকা লইয়াছে, তাহার কন্যার বিবাহের সময় আগত। পূর্বে কুলীনের পণ ছিল, এখন ইংরেজী পাশের পণ। এই পণ দু পুরুষে পা দিতেছে। সমাজের অর্থ-নৈতিক পরি-বর্তনে বিবাহযোগ্য কন্যার পিতা বিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার দুঃখে দুঃখী পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথা ঠিক, তাহাঁর দৌহিত্রীর বিবাহের সময় পাওয়া যাইবে না। তখন জামাই-এর পিতা চিন্তিত হইবেন, না জামাই নিজেই হইবেন? ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া এইখানে হইবে।

আর এত চিন্তার প্রয়োজনই বা কি? বর ক্রমশঃ সাচিব্য হইবেই। পাশ-হওয়া বরের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। হাটে বিক্রেয় বস্তু প্রচুর হইলে যেমন তাহার মূল্য হ্রাস পায়, বরেরও তেমন পাইবে। তখন যোগ্য বর বহু হইলেই আর পাশের মূল্যরূপ বরপণ থাকিবে না।

ফোড়া উঠিবার সময় ব্যথা হয়, পরে শুখাইয়া কিংবা ফাটিয়া যায়, ব্যথা থাকে না। পাশ-হওয়া বর খুঁজিতেই হইবে, এমন কথা বা কি আছে? পাশ হইলেই যুবা সাধু হয় না, সুশীল হয় না। কন্যার চিরায়তির নিমিত্ত টাকারও প্রয়োজন হয় না।

আমাদের দৃষ্টিশক্তি।

এখানে একটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন আলোচনা করা যাইতেছে। বর্তমান শিক্ষার্থী বালক ও যুবকগণের দৃষ্টিশক্তি বাড়িতেছে, না কমিতেছে?

এইরূপ প্রশ্নের মীমাংসার পক্ষে একটি অন্তরায় আছে। তুলনা করিতে গেলেই দুই পক্ষ চাই, এক পক্ষ দেখিয়া ভালমন্দ কিছুই বলিতে পারা যায় না। পূর্বকালে আমাদের দেশের বালক ও যুবকগণের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ কি প্রখর ছিল, তাহা জানিবার উপায় প্রায় নাই। কিন্তু এ নিমিত্ত অতি পূর্বকালের ইতিহাস না পাইলেও চলে। শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমনই জিনিস যে, তাহার বিকার দুইএক পুরুষের মধ্যেই কিছু-না-কিছু ধরা পড়ে। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমরা কি দেখিয়াছি এবং এখন কি দেখিতেছি, তাহা মিলাইলেও ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়।

আজিকালি আমরা যত বালক ও যুবককে চশমা পরিতে দেখিতেছি, বিশ পচিশ বৎসর পূর্বে তত দেখিতাম কি? *

আমার মনে আছে এবং মনে থাকিবার বিশেষ কারণও আছে, আমরা যখন কলেজের দ্বিতীয়বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমাদের প্রায় আশী-জনের মধ্যে কেবল দুইজন চোখে চশমা দিতেন। এই দুইজন দূরের জিনিস দেখিতে পাইতেন না, তাহাঁরা নিকটদৃষ্টি ছিলেন। আমার মনে থাকিবার কারণ এই, আমাকেও শীঘ্র তাহাঁদের দলে মিশিতে হইয়াছিল। কিন্তু চোখে চশমা দিতে কত লজ্জাবোধ করিতাম! পাছে কেহ মনে করে, বাহার দেখাইবার নিমিত্ত চশমা; পাছে কেহ বলে, আহা এই বয়সেই অন্ধ!

---

* ১৩১৪ সালে এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছিল। পরে যে সব ছেলের চক্ষু পরীক্ষার উল্লেখ আছে, সে সব কটক কলেজের ও কলেজের ইস্কুলের ছেলে ছিল।

সে সময়ে, 'চোখে চশমা ঢাকা চাঁপদাড়ী রাখা' ইত্যাদি একটা গানও শুনিতে পাওয়া যাইত। এই সব কারণে চশমা প্রায়ই লুকাইয়া রাখিতে হইত। অথচ দূরের জিনিস দেখিবার উপায়ও ছিল না। এই উভয়সঙ্কটে পড়িয়া এক বিচক্ষণ কবিরাজমহাশয়ের শরণাপন্ন হই। তিনি বলিয়াছিলেন, আয়ুর্বেদে এই নূতন রোগের চিকিৎসা নাই।

তখন চশমা চোখে দিতে কি দুঃখ ও লজ্জা পাইতাম! কিন্তু এখন? পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কি পরিবর্তন হইয়াছে!

এখন কলেজের যুবকগণের কথা দূরে থাক্, ইস্কুলের দুগ্ধপোষ্য ছেলেকে চোখে চশমা দিয়া নিঃসঙ্কোচে বেড়াইতে দেখা যায়। কারণ, কান-কাটার দেশে কর্তিত-কর্ণের লজ্জা থাকে না। বাহারের তরে চশমা,—এ কথা ইঙ্গিতেও শুনিতে পাই না; বালকটির ভাগ্য দেখিয়াও কেহ 'আহা' করে না। সমাজ যেন স্বীকার করিয়া লইয়াছে, লেখাপড়া করিতে গেলেই চক্ষুর মায়া কাটাইতে হইবে। বার-তের বৎসরের বালক চোখে চশমা না দিলে পঁচিশহাত দূরের লোক চিনিতে পারে না, ইস্কুলের কৃষ্ণপট্টে খড়ীতে লেখা অঙ্ক পড়িতে পারে না!

পূর্বকালে এমন হতভাগ্য ছিল কি? অবশ্য ছিল। কিন্তু সংখ্যা বেশী ছিল কি? বোধ হয় না। থাকিলে আয়ুর্বেদে রোগের অন্ততঃ একটা নাম থাকিত।

মহাভারতে, সুশ্রুতে ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে দৃষ্টিশক্তি মাপিবার এক উপায় পাওয়া যায়। লিখিত আছে, বশিষ্ঠ-তারার অরুন্ধতী যে দেখিতে না পায়, তাহার মৃত্যু আসন্ন। এইরূপ, কৃত্তিকা-নক্ষত্রেরও উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, সেকালে এমন লোক অল্পই থাকিত, যাহারা অরুন্ধতী-তারা কিংবা কৃত্তিকার সাতটি তারা দেখিতে পাইত না। অনেকে, বিশেষতঃ যুবকে দেখিতে না পাইলে আসন্নমৃত্যুর কথা উঠিত না। বয়স

বাড়িলে, জরা উপস্থিত হইলে, লোকে অন্ধপ্রায় হয়, কোন তারাই স্পষ্ট দেখিতে পায় না।

অর্থাৎ তখন যাহা বৃদ্ধবয়সে ঘটিত, এখন তাহা কিশোরবয়সেই ঘটিতেছে।

হয় ত সেকালে একালের মত এত অল্প বয়সের বালক একালের তুল্য বিদ্যার্থী হইত না, হয় ত সেকালে ক্ষীণদৃষ্টি বালক কাচময় প্রতিচক্ষুর অভাবে অধ্যয়ন হইতে বিরত হইত। সেকালে দৃষ্টিশক্তিহীন কিংবা অল্পদৃষ্টি বালক থাকিত না বলিতে পারা যায় না। কম থাকিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ চোখ-খোয়ান সভ্যতার একটি লক্ষণ। যে অসভ্য মানবকে দূর হইতে মৃগ অন্বেষণ করিতে হইত, নতুবা আহার জুটিত না; যাহাকে দূর হইতে শত্রু নিরীক্ষণ করিতে হইত, নতুবা রক্ষার উপায় থাকিত না; তাহার চক্ষু অবশ্য প্রখর ছিল। প্রকৃতির উন্মুক্ত ও বিরাট্ ক্রোড়ে যে লালিতপালিত হইয়া থাকে, প্রকৃতিই তাহার শক্তির বিকাশ করিয়া দেন। বিকৃতির ক্ষুদ্র কোটরে আবদ্ধ মানবের ভাগ্যে সে বিকাশ সম্ভবে না। বস্তুতঃ জীবসৃষ্টির মধ্যে এক সত্য এই যে, যে যা চায় সে তা পায়, যে অঙ্গের যে শক্তি যে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার সে শক্তিলাভ হয়। যাহা চাই না, তাহা শীর্ণ হইয়া কালক্রমে লুপ্ত হয়। চীল উচ্চ আকাশ হইতে লক্ষ্য করিয়া বেগে নামিয়া ভক্ষ্যের উপর ছোঁ মারে, আর গৃহ-চটক খাদ্যের সমুখে না গেলে খাদ্য দেখিতে পায় না। মাগুর, শিঙ্গী, কুঁচ্যা প্রভৃতি কর্দমচর মৎস্যের চক্ষু অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়াছে, কিন্তু নির্মল জলচারী রোহিত ও কাতলের চক্ষু বৃহৎ। ইহাই নিয়ম, যে যা চায় না, যাতে যার প্রয়োজন নাই, সে তা পায় না। প্রকৃতিকে ফাঁকি দিতে গেলে প্রকৃতি আমাদিগকে ফাঁকি দেন। কাজেই নগরের গৃহকোটরে কৈশোর ও যৌবন কাটাইলে প্রকৃতিকে অবহেলার প্রতিশোধ পাইতে হয়। দিবারাত্রি ছোট ছোট অক্ষর চোখের কাছে রাখিয়া পড়িলে অল্পদৃষ্টিই লাভ হয়।

বিদ্যার্থী বালক ও যুবকদের অল্পদৃষ্টি হইবার ইহাই মুখ্য কারণ। এই কারণ আছে, ফলও ফলিতেছে। লেখাপড়ায় রতনা হইলে যে দৃষ্টিশক্তি কমে না, এমন নহে। অনেকে পূর্বজন্মফলে অল্পদৃষ্টি হয়, পিতা-মাতার কিংবা অন্য পূর্বপুরুষের দৃষ্টির অল্পতা সন্তানে চলিয়া আসে। ইহা কৌলিক বিকার। এ কারণ না থাকিলেও হয়। এদেশেই দেখা গিয়াছে, পার্বত্য স্থানে ধনৈশ্বর্যশালীর কিশোরপুত্রের দৃষ্টি অল্প হইয়াছে।

চোখের দোষ একপ্রকার নহে। চল্লিশ পার হইলে লোকের চালিশ্যা ধরে। ইহার কারণ চল্লিশবৎসর নহে। বয়সে সকল অঙ্গই শিথিল হয়, চক্ষুর অবয়বও হয়। চোখের পেশী বার্দ্ধক্যের পূর্বে আবশ্যকমত টান কিংবা ঢিলা করিতে পারা যায়, পরে পারা যায় না। ফলে, নিকটের ছোট জিনিস দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই দোষের মূল বাল্যকাল হইতেই বর্তমান থাকে। আমাদের চোখ এমনভাবে নির্মিত যে, নিকটের বস্তু দেখিতে হইলে তাহাকে পীড়ন করিতে হয়। বাল্যে ও যৌবনে সে চেষ্টা আমরা বুঝিতে পারি না। চল্লিশ পার হইলে বুঝিতে পারি, পড়িতে গেলে বহি দূরে ধরিতে হয়, সূচে সূতা পরান কঠিন হয়।

চালিশ্যা ধরিলেই যে এই লক্ষণ দেখা দেয়, এমন নহে। কোন কোন বালকবালিকা জন্মাবধি দূরদৃষ্টি থাকে। নিকটের বস্তু দেখিতে গেলে তাহাদের কষ্ট হয়, চোখ লাল হয়, চোখ দিয়া জল পড়ে, মাথা ধরে, হয় ত গা বমিবমি করে। পড়িবার সময় এই দোষ সহজে ধরা পড়ে।

বস্তুতঃ ইহাদের চোখ চেপটা। চোখের মধ্যে একটা অবয়ব আছে, যার ভিতর দিয়া বাহিরের আলো চোখের পশ্চাতে এক পটে গিয়া পড়ে। সেই-খানে দৃষ্টবস্তুর একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ উৎপন্ন হয়। সেই অবয়ব, চক্ষুর কাচ। ইহা পটের যতদূরে থাকিবার কথা, ততদূরে থাকে না। সে চোখের

পটে কেবল দূরের বস্তুর প্রতিরূপ স্পষ্ট পড়ে, নিকটের বস্তুর স্পষ্ট পড়ে না।

এরূপ চোখের বিপরীত, লম্বা চোখ। সে চোখের কাচ হইতে পট পশ্চাতে দূরে থাকে। উভয়ের মধ্যে যত অন্তর থাকিবার কথা, তাহা অপেক্ষা বেশী থাকে। ফলে সে চোখের পটে নিকটের বস্তুর প্রতিরূপ স্পষ্ট পড়ে, দূরের বস্তুর স্পষ্ট পড়ে না।

এই দুই ছাড়া চোখের আরও অনেকরকম দোষ ঘটে। কোন কোন চোখ সব দিকে সমান গোল না হইয়া কোনদিকে বেশী, কোনদিকে কম গোল। ফলে সেই ঢালু চোখে দৃষ্ট বস্তুর প্রতিরূপ কোনদিকে কিছু ছোট হয়, কোনদিকে লম্বা হয়। অধিকাংশ চোখ স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধ্ব দিকে কিছু বেশী গোল।

ঠিক চোখ বড় সাধারণ নয়। প্রায়ই কোন-না-কোন দোষ থাকে। দুই চোখই ঠিক, এমন ভাগ্য অল্পেরই ঘটে। বিলাতে শতকরা পনর জনের দুই চোখ দৃষ্টিতে সমান। কোন কোন লোক লেটা হয়। তাহারা বাঁ হাতে কাজ করিতে পটু। কোন কোন লোক বাঁ-পা আগে ফেলে। দুই পা, দুই হাত, দুই কান, দুই চোখ কদাচিৎ শক্তিতে সমান হয়।

বস্তুতঃ প্রকৃতিতে অসমতাই সাধারণ, সমতা আকস্মিক। বিজ্ঞান এই অসমতা লক্ষ্য করে, অজ্ঞান সমতা খুঁজিয়া বেড়ায়। অসমতার মধ্যেই একটাকে আদর্শ ধরিতে হয়। সেই আদর্শ ধরিলে কোন চোখ ভাল, কোন চোখ মন্দ দাঁড়ায়। যে চোখ সেই আদর্শের মত হয়, তাহাকে ভাল বলি, স্বাভাবিক বলি; যে চোখ না হয়, তাহাকে মন্দ বলি, অস্বাভাবিক বলি।

আমরা চোখ দিয়া বস্তুর আকার ও বর্ণ দেখি। চোখের এই দুই বৃত্তি এক নহে। আকার স্পষ্ট দেখিতে পাই, কিন্তু হয় ত স্বাভাবিক বর্ণ দেখিতে

পাই না। অন্যপক্ষে, স্বাভাবিক বর্ণ দেখিতে পাই, হয় ত আকার স্পষ্ট দেখিতে পাই না।

তবে চোখের পরীক্ষা দুই রকমের করিতে হয়। নিত্য কাজে আকার দেখা পরীক্ষা হইতে থাকে। তাই আমরা চোখের দোষ বলিলে কেবল দৃষ্টি-শক্তির অল্পতা বুঝি। যাদের কাজে জিনিসের রং দেখা আবশ্যক হয়, তাদের চোখের দ্বিতীয় পরীক্ষা হয়।

দৃষ্টবস্তুর সকল অবয়ব স্পষ্ট দেখিতে পাইলে আমরা বলি চোখ তীক্ষ্ণ। এই হিসাবে নিকটদৃষ্টি যুবকের চোখ তীক্ষ্ণ। চোখের কাছের জিনিস সে বেশ দেখিতে পায়; এমন কি, যার চোখ ভাল, তার অপেক্ষাও সে ভাল দেখে। জিনিস দূরে থাকিলেই তার বিপদ্। তেমনই যে দূরদৃষ্টি, সে চোখের দূরের জিনিস বেশ দেখিতে পায়, জিনিসটি কাছে থাকিলেই তার বিপদ্। যার চক্ষু স্বাভাবিক, সে দূরের জিনিস যেমন স্পষ্ট দেখে, নিকটের জিনিসও তেমন স্পষ্ট দেখে।

এরূপ চোখের শক্তিরও একটা সীমা আছে। সে সীমা দূরের জিনিসে নয়, কাছের জিনিসে। সে চোখে আকাশের তারা আলোকবিন্দু অপেক্ষা বড় দেখায় না। ইহাতেই সে চোখের তীক্ষ্ণতা। তারাগুলা বৃহৎ বটে, কিন্তু অসীম দূরে আছে বলিয়া জ্যোতিঃকণা বই বড় দেখায় না। ভাল দূরবীণের পরীক্ষাও তাই। যে দূরবীণে তারার বিম্ব দেখায়, তাহা ভাল নয়। স্বাভাবিক চক্ষু অসীম দূরের জিনিস দেখিতে পায়, কিন্তু খুব কাছের জিনিস পায় না। অর্থাৎ চোখে লাগাইয়া কোন জিনিসই দেখিতে পাওয়া যায় না। চোখ হইতে অন্ততঃ পাঁচ-ছয়-ইঞ্চি দূরে না ধরিলে ভাল চোখে স্পষ্ট দেখিতে পায় না। ইহাই ভাল চোখের নিকটসীমা।

নিকটদৃষ্টি চোখের নিকটসীমা আরও কাছে। চোখ হইতে দুই-তিন-ইঞ্চি দূরে বই ধরিয়া পড়িতে পারা যায়। তেমনই সে চোখের দূরসীমাও কাছে,

পাঁচ সাত কি আট দশ ইঞ্চির বেশী নয়। যদি বই পড়িতে হয়, ইহারই মধ্যে ধরিতে হইবে। যদি মানুষের মুখের অবয়ব দেখিতে হয়, ইহারই মধ্যে দেখিতে হইবে।

দূরদৃষ্টি চোখের নিকটসীমা কিছু দূরে, হয় ত দশ-বার-ইঞ্চি, হয় ত কুড়ি-বাইশ ইঞ্চি। কিন্তু দূরসীমা অনন্ত। চালিশ্বার চোখও এইরকম। পড়িতে গেলে বই দূরে ধরিতে হয়।

যদি হতভাগ্যের তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে নিকটদৃষ্টিই বেশী হত-ভাগ্য। স্বাভাবিক দৃষ্টির সীমা পাঁচ ছয় ইঞ্চি হইতে অনন্ত। দূরদৃষ্টির সীমা কুড়ি-বাইশ ইঞ্চি হইতে অনন্ত। কিন্তু নিকটদৃষ্টির সীমা দুই-তিন-ইঞ্চি হইতে সাত-আট ইঞ্চি মাত্র! ইহার তুল্য হতভাগ্য কে আছে? অজ্ঞান যুবক জানে না, তাই চোখে চশমা দিয়া স্বচ্ছন্দমনে বেড়াইতে পারে। দূরের দীপশিখা, আকাশের তারা হতভাগ্যের চোখে আলোর কোঁটা বোধ হয়। সাধ্য কি, সে কৃত্তিকার তারা গণে, বশিষ্ঠ হইতে অরুন্ধতী পৃথক্ দেখে।

বাস্তবিক কৃত্তিকার তারা গণিয়া দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা মাপিতে পারা যায়। অনেক চোখে কৃত্তিকায় সাতটি তারা দেখে, কোন কোন চোখে আট দশ এগার চৌদ্দ পর্যন্ত দেখে। ছয়টি গণিতে পারিলে মন্দের ভাল। একটিও না পারিলে? নিকটদৃষ্টি চোখে এইরকম। তেমনই যে চোখে অরুন্ধতী দেখা যায় না, সে চোখও গত। কৃত্তিকায় সাতটি তারা কিংবা বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী পৃথক্ দেখিতে পাইলেই চোখ তীক্ষ্ণ বলা যায় না। বলা যায়, চোখ যায় নাই, আছে। এই হিসাবে প্রাচীনদিগের এই তারাপরীক্ষা ঠিক।

বস্তুতঃ একই রকমের দুইটি জিনিস কাছে কাছে থাকিলে সে দুইটি পৃথক্ দেখা কঠিন হয়। দুইটি জিনিস যত দুই রকমের হয়, পৃথক্ দেখাও তত সোজা হয়। নীল আকাশে উজ্জ্বল সাদা তারা দেখা সোজা কথা। চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় ছোট তারা অদৃশ্য হয়, সূর্যের আলোকে সব তারাই অদৃশ্য হয়।

কখনকখন দিনের বেলা শুক্রগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, আকাশের কোন্ জায়গায় আছে, তাহা না জানিলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হয়।

ভাল চোখে কত দূরের জিনিস দেখিয়া চিনিতে পারা যায়? জিনিসটা আছে কি না, দেখিয়া তাহা বলা, আর সেটা কি জিনিস, তাহা ঠিক করা এক কথা নয়। কি জিনিস, তাহা ঠিক করিতে পূর্বের অভিজ্ঞতা ও মনের অন্যান্য অনেক ব্যাপার আবশ্যক। দূরে বহি ধরিয়া পড়িতে পারাতেও এইরূপ ব্যাপার আসে। তথাপি লেখা পড়িয়া চোখের তীক্ষ্ণতা মোটামুটি মাপিতে পারা যায়।

একটা কলম চোখের সমুখে ধরিলে কলমটির দুই প্রান্ত হইতে দুই রেখা চোখে গিয়া মিলিত হয়। এই দুই রেখার মধ্যে যে কোণ হয়, তাহাকে দৃষ্টি-কোণ বলা যায়। দেখা যায়, কলমটি যত দূরে ধরি, দৃষ্টি-কোণও তত ছোট হয়। বহুদূরে লইলে দৃষ্টি-কোণ এত ছোট হয় যে, কলম আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কলম যত লম্বা, তাহার প্রায় সাতশতগুণ দূরে লইলে দৃষ্টি-কোণ পাঁচ কলামাত্র হয়। ভাল চোখে অত দূরের কলম বেশ দেখিতে পায়। এমন কি, এক হাজার গুণ দূরে লইলেও কোন কোন চোখে দেখিতে পায়। তখন দৃষ্টি-কোণ প্রায় তিনকলা হয়। চোখের কিন্তু, এত তীক্ষ্ণতা সাধারণ নহে। মোটের উপর যে চোখে পাঁচকলা দৃষ্টি-কোণে দেখিতে পায়, তাহা ভাল বলিতে পারা যায়। দৃষ্টি-কোণ পাঁচকলার বেশী আবশ্যক হইলে চোখ ভাল নহে। এই বই যে অক্ষরে ছাপা হইয়াছে, সে অক্ষর ৪৷৷০ ফুট দূর হইতে পড়িতে না পারিলে চোখ ভাল নহে।

এখানকার কলেজের ও ইস্কুলের অনেক যুবক ও বালকের চোখের তীক্ষ্ণতা ঐ রকম এক উপায়ে মাপা গিয়াছিল। এখানে পরীক্ষার ফল দেওয়া যাইতেছে। ইস্কুলের প্রথমশ্রেণীর বালকদের চোখ পরীক্ষা করা হয় নাই। তাহারা তখন ছিল না। অন্যান্য শ্রেণীর বালকেরা ৮।১০ হইতে

১৫।১৬ বছরের ছিল। এইরূপ ১৯০ জন ছেলের মধ্যে ১৮ জন ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই। অর্থাৎ শতকে ৯।১০ জনের চোখ ভাল নহে। তাহারা নিকটদৃষ্টি।

কিন্তু কলেজের ছেলেদের মধ্যে নিকটদৃষ্টির সংখ্যা অনেক বেশী। ৬৪জনের মধ্যে ১৯ জন নিকটদৃষ্টি, অর্থাৎ শতকে প্রায় ৩০ জন। এই ১৯ জনের মধ্যে ৯ জন এত নিকটদৃষ্টি যে, তাহারা চশমা লাগাইবার যোগ্য হইয়াছে। দুইচারিজন চশমা ধরিয়াছে। এত অল্প ছেলে লইয়া হারাহারি করা ঠিক নহে। তথাপি দেখা যাইতেছে, ইস্কুলে যত, কলেজে তার অন্ততঃ দুইগুণ ছেলে নিকটদৃষ্টি! বলা আবশ্যক, কলিকাতার 'সভ্যতা' এখানে এখনও সম্পূর্ণ পৌঁছে নাই, এবং কলিকাতায় এখনও বিলাতের তুল্য শিক্ষাবিস্তার হয় নাই।

যে সকল ছেলের চোখ পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহাদের কতক ওড়িয়া, কতক বাঙ্গালী। আশ্চর্যের কথা, ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে নিকটদৃষ্টি ওড়িয়া ছেলে যত আছে, বাঙ্গালী ছেলে তত নাই। কিন্তু কলেজে ওড়িয়া ও বাঙ্গালী ছেলে প্রায় সমান দাঁড়াইয়াছে। বরং বাঙ্গালী-ছেলে কিছু বেশী হইয়াছে।

বিলাতের তুলনায় আমাদের দেশের ছেলেদের চোখ ভাল। লণ্ডনের ইস্কুলের ৮ হইতে ১০ বছরের ছেলেমেয়ের মধ্যে শতকরা ৬০ জনের চোখের দোষ আছে। মোটের উপর বিলাতে নাকি শতকরা ৩৯ জনের চোখ খারাপ,—পাঁচকলা দৃষ্টি-কোণে দেখিতে পায় না।

বিলাতের তুলনায় এ দেশ এখনও ভাল বটে, কিন্তু এদেশেও আশঙ্কার কারণ আছে। ইস্কুলের চেয়ে কলেজে নিকটদৃষ্টির সংখ্যা বেশী কেন? একটা কারণ সহজে মনে হয়। কলেজের ছেলে বেশী পড়িয়াছে, ছোট ছোট অক্ষর বেশী দেখিয়াছে। অনেক ছেলে হয় ক্ষীণ

আলোতে, না হয় কেরোসীনের প্রচণ্ড তাপে ও আলোতে পড়ে। প্রখর আলোতে পড়িতে পড়িতে চোখ ক্ষরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ ঝুঁকিয়া পড়িতে থাকে, মাথায় চোখে রক্ত যায়। কলেজের কোন কোন যুবক দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করে। দিনের বেলা ঘুমাইয়া গল্প করিয়া কাটায়, রাত হইলে শোধ তোলে। কেহ কেহ বিছানায় শুইয়া থাকিয়া পড়ে। এইরূপ নানা কারণে চোখ যে খারাপ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বাভাবিক অবস্থার যোগ্য হইয়া আমাদের চোখ সৃষ্ট হইয়াছে। অস্বাভাবিক অবস্থার যোগ্য হয় নাই। অবিরত এক রঙ্গের ছোট ছোট অক্ষর দেখা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক। সৌভাগ্যের বিষয়, নাগরী ও বাঙ্গালা প্রভৃতির ছাপার অক্ষর খুব ছোট করিবার জো নাই। কিন্তু যুক্তাক্ষরের বাহুল্যে ফলে ছোট অক্ষরই দাঁড়াইয়াছে। দুইটা অক্ষর, তিনটা অক্ষর যুক্ত হইলে এক একটা অক্ষর অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। তত ক্ষুদ্র অক্ষরের প্রত্যেক অংশ না দেখিলে পড়িতে পারা যায় না। ওড়িয়া, তেলুগু, তামিল, ফার্সী, যুক্তাক্ষরের এক একটি অক্ষর এত ছোট হয় যে, জানিলেও চোখকে বিলক্ষণ পীড়ন করিতে হয়। ইংরেজী ছাপার অক্ষরের পরিমাণ আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। ইংরেজীতে যুক্তাক্ষর নাই। সব অক্ষর পৃথক্ পৃথক্ ছাপিতে হয়। যদি চোখের প্রতি মায়া থাকে, তাহা হইলে ছোট অক্ষর ত্যাগ করিতে হইবে। কোন কোন গ্রন্থপ্রকাশক বহির দাম সস্তা করিতে গিয়া পাঠককে সস্তার তিন অবস্থায় ফেলেন। অক্ষর ছোট, কাগজ পাতলা, কালী ফিকা, ছাপা ভাঙ্গা। ইত্যাদি নানা দোষ সস্তার বহিতে দেখা যায়। এ বিষয়ে মাহ্‌নের বহি চিরবিখ্যাত। সাদা চক্‌চক্যে কাগজে, চক্‌চক্যে কালীতে ছাপা বহিও চোখের অনিষ্ট করে। সেকালে হলুদ্যে কাগজে পুঁথী লেখা হইত। বেশ ব্যবস্থা ছিল। হাতের তৈয়ারি কাগজ ছিঁড়িতে জানিত না, হরিতালের গুণে পোকা লাগিত না,

কজ্জলের গুণে দেশী কালী হলুদ্যে কাগজে বেশ মানাইত, কখনও ফিঁকা হইত না। "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।" কেবল ধোয়াতে নহে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রখর আলোতেও মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। দেশী কালীর এই মস্ত গুণ। তার উপর অক্ষর গোটা-গোটা, পড়িতে কোন কষ্ট নাই। বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত অধিকাংশ বাঙ্গালা ছাপার অক্ষর সরু। ইহা অপেক্ষা খ্রীষ্টানী ছাপাখানার অক্ষর মোটা ও দেখিতে সুন্দর। বালক-বালিকার পাঠ্যপুস্তকে ছোট অক্ষর ও ছাপার দোষ অমার্জনীয়।

বাঙ্গালায় কতকগুলি ছেলেভুলান হাসি-তামাসার বহি হইয়াছে। অনেকে এই সকল বহির খুব প্রশংসাও করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই প্রশংসার কোন হেতু পাই না। আমার বিবেচনায় এই সকল ছেলে-ভুলান বহি ছেলে-ভুলানই হইয়াছে, শিক্ষার সোপান হয় নাই। অধিকাংশের মধ্যে মাথামুণ্ড কোন আদর্শ পাই না। কতকগুলা রঙ্গ, বে-রঙ্গের চিত্র ছাপাইলেই যদি শিশুশিক্ষা সহজে হইতে পারিত, তাহা হইলে কেবল পট ছাপাইলেও চলিত। উপস্থিত প্রসঙ্গে বিশেষ আপত্তি, বহির লেখা সাজানতে, নানা রঙ্গের কালীতে। শাদার উল্‌টা কাল বলিয়াই জানি। এই সকল বহিতে শাদার উল্‌টা লাল, সবুজ, হলুদ্যে, বেগুন্যে, প্রায় সব রঙ্গাই দেখিতে পাই।

বাস্তবিক বর্ণজ্ঞানসম্বন্ধে আমরা উন্নতি করিতে পারি নাই। অনেক লোক সবুজ, নীল ও কাল রঙ্গের প্রভেদ বুঝিতে পারে না। আমার মনে হয়, ইহারই ফলে কৃষ্ণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের গাত্রবর্ণ নীল, এবং মহিষমর্দিনীর প্রতিমার অসুরের গাত্রবর্ণ হরিৎ হইয়াছে, কৃষ্ণবর্ণ শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণের উপমা নবদূর্বা-দলে দেখিতে হইয়াছে। চোখে বর্ণজ্ঞানের অভাব এই সব দৃষ্টান্তের মূল। চোখে বর্ণজ্ঞান মানুষের সৃষ্টি হইতেই হয় নাই। বর্ণজ্ঞানের ক্রমবিকাশ হইয়াছে। প্রমাণ, শিশুর বর্ণজ্ঞানের বিকাশে স্পষ্ট পাওয়া যায়। বর্ণজ্ঞান ও স্বরজ্ঞান প্রায় একই রকমের। কাহারও প্রকৃতিদত্ত স্বরজ্ঞান থাকে।

সে অক্লেশে গান গাইতে শিখে। কেহ বা বহুকাল গর্দভ-চীৎকার করিয়াও কানে স্বরের প্রভেদ ধরিতে পারে না। এরূপ বৈষম্য আছে এবং থাকিবে। প্রকৃতির দান মুক্তহস্তে নহে, সাধারণে সমান নহে। পূর্বজন্মের কর্মফলেই হউক, আর সৃষ্টির নির্বাচন-সার অভিব্যক্তিতেই হউক, শেষ ফল একই। দেখা গিয়াছে, যে চিত্রকলাশালায় চিত্র আঁকিতে রং ফলাইতে শিখিয়াছে, সেও অতর্কিতভাবে সবুজকে নীল এবং নীলকে সবুজ মনে করিয়াছে। তথাপি শিক্ষাদ্বারা সা-রি-গা-মা স্বর-জ্ঞান জন্মিতে পারে, বর্ণজ্ঞানও পারে।

এখানকার কলেজের যুবকদের বর্ণজ্ঞান পরীক্ষা করা হইয়াছিল। নানা রঙ্গের উর্ণার গুছি লইয়া এই পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ফল দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হইয়াছে। ৬৯ জনের মধ্যে ২ জন লাল-সবুজ বর্ণান্ধ, ৩১ জন ঈষৎ সবুজ ও ঈষৎ নীলের প্রভেদ হঠাৎ বুঝিতে পারে নাই। শেষোক্ত দলে ওড়িয়া-ছেলে বেশী। *

যার চোখ ভাল, তার কাছে আ-হরিৎ ও আ-নীল বর্ণে অনেক প্রভেদ। সেতার বাজানায় কলাবৎ যেমন রাগিণীবিশেষে মধ্যম স্বরের একটু উচুনীচুতে কানে শূলবেদনা অনুভব করেন, তেমনই যার বর্ণজ্ঞান আছে, সে আ-হরিৎ ও আ-নীলের মধ্যে মস্ত প্রভেদ দেখে।

যাহা হউক, এই পরীক্ষার পূর্বে আমার মনে হয় নাই যে, আমাদের দেশেও বর্ণান্ধ লোক অন্ততঃ শতকে ২ জন হইবে। লাল-সবুজ-বর্ণান্ধের চোখে লাল ও সবুজ একই-রকম দেখায়। কেহ কেহ গাঢ় লাল ও গাঢ় সবুজ পৃথক্ করিতে পারে। কিন্তু ঈষৎ লাল ও ঈষৎ সবুজ হইলেই মুস্কিলে পড়ে। যাহার বর্ণজ্ঞান স্বভাবতঃ প্রখর, তাহাকে ভাবিতে হয় না, দেখিবামাত্র ঈষৎ লাল, ঈষৎ সবুজ, ঈষৎ নীল ইত্যাদি পৃথক্ করে, এবং পৃথক্ পৃথক্ নামও বলে।

* বিলাতে শতকে ৪।৫ জন লাল-সবুজ-বর্ণান্ধ। নীল-সবুজ-বর্ণান্ধ লোকও আছে, এবং সংখ্যায় প্রায় ঐরূপ।

বর্ণজ্ঞানের অভাবে সংসারের কাজকর্মে বড় একটা অসুবিধা হয় না ; তাই বর্ণসম্বন্ধে কার চোখ ভাল, কার চোখ মন্দ, তাহা জানিবার সুযোগ হয় না। যারা চিত্রকলা শিখিতে চায় কিংবা রং লইয়া কাজ করিতে চায়, তাদের বর্ণজ্ঞান না থাকিলে চলে না। কিমিতি-বিদ্যা-শিক্ষার্থী এক যুবককে লইয়া একবার বড় মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল। কোন কোন দ্রব্য-বিনিশ্চয়ের নিমিত্ত বর্ণ তুলনা করিতে হয়। সে যুবক যে উপায়ে দ্রব্য-বিনিশ্চয় করিতেছিল, তাহাতে সে দ্রব্যের রং ঈষৎ লাল হইবার কথা। কিন্তু তার চোখে সবুজ দেখাইতেছিল। আমি দেখিলাম স্পষ্ট লাল, তবু সে বলে সবুজ! শেষে মনে হইল, সে হয় ত লাল-সবুজ-বর্ণান্ধ। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, বাস্তবিক তাই। অতএব বর্ণজ্ঞানের অভাবে এক দেখিতে আর এক দেখিয়া বিপদ ঘটিতে পারে। কোকিলের স্বর পঞ্চম কি ধৈবত, তাহা না বুঝিলে হয় ত কবি ব্যতীত অন্যের চিত্তবিকার না ঘটিতে পারে, কিন্তু লাল কি সবুজ, ইহা না বুঝিতে পারিলে নদীতে জাহাজে-জাহাজে, রেলে গাড়ীতে গাড়ীতে সংঘর্ষণ ঘটিতে পারে। বস্তুতঃ চোখের তুল্য পরমসহায় আমাদের আর কোন্ ইন্দ্রিয় আছে?

অথচ আমরা চোখ লইয়া খেলা করি। কি করিয়া চোখকে ভাল রাখিতে পারা যায়, তাহা আমরা ভাবি না। খারাপ হইলে দৌড়াইয়া গিয়া চশমা কিনিয়া নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু, চশমা হাজার আঁটি, চোখ গেলে আর পাই না। আধুনিক বিজ্ঞান চশমা গড়িতে পারে, দূরবীণ গড়িতে পারে। কিন্তু চশমা দিয়া কিংবা দূরবীণ দিয়া খারাপ চোখ ভাল চোখের তুল্য করিতে পারে না। এ কথা সকলেই জানে, তবু অল্প লোকেই চোখের তরে চিন্তিত হয়। এই কারণেই সেকরা, ঘড়ী-আলা, ঔষধ-বিক্রেতা, এমন কি ফেরীওয়ালাও চশমা লইয়া দোকান সাজাইয়া বসিতে সাহস পায়। কেহ কেহ এমন নির্বোধ যে, ঘড়ী সোনার না হইলে ভাল নয় মনে করে। তেমনই

সোনার চশমা চোখে দিয়া মনে করে, চোখের যথোচিত যত্ন করা হইল। সেকরা সোনার ডাঁটি গড়িয়া দিতে পারে, কিন্তু সে চশমা ঠিক করিয়া দিতে পারে কি? চশমার মধ্যস্থল চোখের তারার সমুখে থাকা চাই। সে কি তা জানে? সাধারণ চশমাওয়ালাই কি এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখে? অনেকের চশমার এই দোষ দেখা যায়। যাদের চালিশ্‌চা ধরিয়াছে, তাদের কথা কিছু স্বতন্ত্র। তারা যে চশমা দিয়া ভাল দেখিতে পায়, সে চশমা তাদের ঠিক। কিন্তু কতজন বলিতে পারে, ভাল দেখিতেছে কি না? কথাটা শুনিতে নূতন ঠেকে, তথাপি পুনঃপুন দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ লোক জানে না, তাদের চোখের দোষ আছে কি না; জানে না, চোখে চশমা ঠিক হইয়াছে কি না। এ বিষয়ে শিক্ষা-অশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা-নিম্নশিক্ষায় কোন প্রভেদ দেখা যায় না। চশমা ত চশমা, যা-তা একটা লাগাইলে হইল। চশমা দিয়াও যদি দেখিতে না পায়, চশমা দিলে যদি মাথা ধরে, চোখ দিয়া জল পড়ে, চোখ ব্যথা করে, তবেই জানে চশমা ঠিক হয় নাই, বদলান দরকার।

কেহ বলে, আমার চোখ খারাপ হইয়াছে, কাছে না গেলে আমি কলেজে বোর্ডে লেখা পড়িতে পারি না। কেহ বলে, রাত্রে লেখাপড়া করা দায় হইল, অক্ষর দেখিতে পাই না। অমনই চশমার দোকানে উপস্থিত! চক্ষুপরীক্ষা এমনই সোজা! চোখের কি রকম দোষে চশমা দেওয়া কর্তব্য, কি রকম দোষে না দেওয়া কর্তব্য, কেবল তাহা চক্ষুরোগ-অভিজ্ঞ বিচক্ষণ চিকিৎসক বলিতে পারেন। বিচক্ষণ চিকিৎসকের উপদেশ না লইয়া চশমা দিয়া চোখের সঙ্গে খেলা করিলে চোখের অহিত হইতে পারে। আমার নিজের অবস্থা বলি। দূরের জিনিস দেখিতে পাইতাম না; এই হেতু কলিকাতা মেডিকাল কলেজের চক্ষুরোগ-পরীক্ষক ডাক্তারকে চোখ দেখাই, তিনি ব্যবস্থা লিখিয়া দিলেন, সে পত্র লইয়া চশমার বড় এক দোকানে চশমা কিনিতে যাই। দোকানে একজন ছিল, সে পত্রখানি একবার দেখিয়া অনেক চশমা দিয়া

একেএকে পরিতে বলিল। একজোড়া চোখে দিতে দূরের গাছ-পালা বেশ দেখিতে পাইলাম। বিক্রেতা সেই জোড়া আমার চোখে ঠিক হইয়াছে বলিয়া দাম লইয়া বিদায় করিল। চোখের সঙ্গে এই প্রথম পরীক্ষা। ফলে দুইবৎসরের মধ্যেই বুঝিলাম, আগের চেয়ে চোখ খারাপ হইয়াছে। তখন ভয় হইল, দোকানদারের কাছে না গিয়া চক্ষুচিকিৎসকের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি অবস্থা দেখিয়া চশমা ফেলিয়া দিয়া পড়াশুনা বন্ধ করিতে আদেশ করিলেন। অতএব চোখে দেখিতে অসুবিধাবোধ করিলেই চশমা দিতে হইবে, কিংবা চশমা না দিলে চোখ ভাল হইবে, এমন কোন কথা নাই। যাহা হউক, আমি বুঝিয়াছিলাম, সেই প্রথম-চশমা-বিক্রেতা আলস্যবশতঃই হউক, কি অজ্ঞানতাবশতঃই হউক, আমার চোখের পরকাল খাইয়াছে। যে নম্বরের চশমা দিলে চোখ থাকিত, তাহা না দিয়া বেশী নম্বরের দিয়াছিল।

বস্তুতঃ বিক্রেতার জ্ঞান কিংবা ধর্মের ভরসায় চোখ ছাড়িয়া দেওয়া মূর্খতা। বিক্রেতা নহে, প্রবীণ বিচক্ষণ চিকিৎসক একমাত্র সহায়। দৃষ্টি-শক্তির সহিত শরীরের নানা অঙ্গের সম্বন্ধ আছে। অনভিজ্ঞ বিক্রেতা এ কথা জানিতে পারে না। কোন কোন বিক্রেতা চশমার নম্বরই জানে না, কেহ কেহ বলিতে চায় না। উদ্দেশ্য কি? পাছে হতভাগ্য পরে সে দোকানে না আসিয়া অন্য দোকানে চশমা কেনে। *

---

* চশমার নম্বরের ভিতরে একটা ভয়ানক ব্যাপারও নাই। দূরদৃষ্টির ও চালিশ্যার চশমার মাঝখান পুরু। এই চশমা রোদে সূর্যের দিকে ধরিলে বিপরীত দিকে এক আলোক-বিন্দু দেখা যায়। চশমা হইতে এই আলোকবিন্দুর অন্তর, সম্পাতান্তর। যে চশমার সম্পাতান্তর ৪০ ইঞ্চি, তার নম্বর ১; যার ২০ ইঞ্চি, তার নম্বর ২; যার নম্বর ২॥, তার সম্পাতান্তর ১৬ ইঞ্চি. ইত্যাদি। অর্থাৎ ৪০ ইঞ্চি ÷ সম্পাতান্তর = নম্বর। চালিশ্যার চশমার নম্বর প্রায়ই ২ কি ২॥ হইতে দেখা যায়। নিকটদৃষ্টির চশমার মাঝখান পাতলা,—চালিশ্যার চশমার ঠিক বিপরীত। এরূপ চশমা রোদে ধরিলে আলোকবিন্দু পাওয়া যায় না। কিন্তু

চোখ ভাল রাখিবার উপায় কি? চালিশ্যা বন্ধ করিবার উপায় নাই। কিন্তু বালকের ও যুবার দূরদৃষ্টিতা ও নিকটদৃষ্টিতা অবহেলা করা উচিত নহে। বোধ হয়, এদেশে দূরদৃষ্টি বালক ও যুবা কম। বিলাতে নাকি অনেক। যাহাতে চোখ নিকটদৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে বালকের অভিভাবকের ও ইস্কুলের অধ্যক্ষের দৃষ্টি কর্তব্য। বালককে ছোট বাড়ীতে ছোট ঘরে নিরন্তর রাখিলে সে নিকটদৃষ্টি হইতে পারে। বালক হউক, যুবক হউক, তাহাকে বাড়ীতে ও ইস্কুলে মোট ৮ ঘণ্টার বেশী পড়িতে দেওয়া উচিত নহে। সে প্রচুর ঘুমাইবে, ফাঁকা জায়গায় প্রচুর খেলা করিবে, তবে তাহার স্বাস্থ্য ও চোখ ভাল থাকিবে। দূরের জিনিস দেখিবে, ছোট অক্ষর পড়িবে না, চোখকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে না দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়িবে না, যথেষ্ট আলো থাকিবে, কিন্তু আলো প্রখর হইবে না, টেবিল কিংবা ডেস্‌ক খুব উঁচু কিংবা খুব নীচু হইবে না, ইত্যাদি নানা বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। একই রকমের জিনিস দেখিতে দেখিতে চোখের ক্লান্তি আসে। কেবল চোখ বুজিয়া থাকিলে চোখের বিশ্রাম হয়, এমন নহে। নানা রঙের জিনিস দেখিলে বিশ্রাম হয়, বর্ণ-জ্ঞান রক্ষা হয়। প্রকৃতির শোভা দেখায় কেবল কি মনের আনন্দ হয়? চোখের আনন্দ হয়, ইহাতে চোখের ক্লান্তিও যায়। রাত্রিকালে তারা দেখিলে চোখের উপকার হয়। অত দূরে আর কোন জিনিস নাই, অমন তৃপ্তিকর আলোও আর জিনিসের নাই। হিন্দুর ত্রিসন্ধ্যা উপাসনাসময়ে সূর্য-নিরীক্ষণের বিধি আছে। বোধ হয়, ইহা দ্বারা চক্ষু

কৌশলক্রমে সম্পাতান্তর মাপিতে পারা যায়। তখন নম্বরও জানা যায়। এই দুইরকম চশমা পৃথক্ বুঝাইতে মাঝ-পুরু চশমার নম্বরের আগে ধনচিহ্ন [+], এবং মাঝ-পাতলা চশমার নম্বরের আগে ঋণচিহ্ন [−] দেওয়া হয়। যে চোখে −১, কি −২ নম্বরের চশমা লাগে, সে চোখ বেশী খারাপ নয়। নিকটদৃষ্টির চশমার নম্বর প্রায়ই −৫, ও −৭ এর মধ্যে হইতে দেখা যায়। চালু চোখের চশমা আর একরকম। এক কথায় বলিবার নহে।

প্রখর-আলোক-সহ হয়। যদি কৃত্রিম উপায় করিতে হয়, এবং জনাকীর্ণ নগরে কৃত্রিম উপায় আবশ্যকও বটে, বাড়ীর ও ইস্কুলঘরের দেওয়ালে ভাল ভাল রঙ্গিন পট রাখা আবশ্যক। আমরা ফুলবাগানের ও পটের গুণ বুঝি না। তাই ইস্কুলে ইস্কুলে ফুলবাগান দেখি না, ইস্কুলঘরের দেওয়ালে পট রাখি না। সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নাককে আমরা অনাবশ্যক মনে করি। তাই ফুলের সুবাস খুঁজি না, নাকের দ্বারাও যে আনন্দ উপভোগ করিতে পারা যায়, তাহা মনে করি না। ইস্কুলে নাম লিখাইবার সময় অধ্যক্ষমহাশয় বালকের নাড়ীনক্ষত্র সকল বিষয়েরই সংবাদ লইয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, বালকের শরীরের দুর্বলতা, কণ্ঠস্বরের নিম্নতা, চক্ষুকর্ণের শক্তির খর্বতা, জিহ্বার অসাড়তা, বক্ষের ক্ষীণতা ইত্যাদি দেহের ব্যাপার জানিবার ও দোষের প্রতিকার করিবার আবশ্যকতা অনুভূত হয় না। মাথায় বিদ্যার বোঝা চাপাইয়া কি ফল, যদি বোঝার ভারে বিকলাঙ্গ হইতে হয়, শরীর ভাঙ্গিতে হয় ?

এক কবি বলিয়াছেন,—

বিকাশয়তি লোচনে স্পৃশতি পাণিনা কুঞ্চিতে বিদূরমবলোকয়ত্যতিসমীপসংস্থং পুনঃ।
বহির্ব্রজতি চাতপে স্মরতি নেত্রবৃত্তিং পুমান্ জরাপ্রমুখসংস্থিতঃ সমবলোকয়ন্ পুস্তকম্॥

জরা-আরম্ভে লোকে পুস্তক পাঠ করিবার সময় কুঞ্চিত লোচনদ্বয় বিকাশিত করে, তবু দেখিতে পায় না। হাত দিয়া চক্ষু প্রসারিত করে, তাহাতেও দেখিতে পায় না। পুস্তক একবার দূরে ধরে, একবার অতিনিকটে ধরে, কিছুতেই পড়া যায় না। মনে করে, ঘরে আলো কম, তাই বাহিরে যায়। সেখানেও দেখা যায় না। তখন রোদে ধরে, কিন্তু যে অবস্থা সেই অবস্থাই থাকে। অবশেষে সে চক্ষুর বৃত্তি স্মরণ করে।

জরাতে লোকের চক্ষুর দশা এমনই হয়। কখন-কখন চোখে ছানি পড়ে, স্বচ্ছ চক্ষু অস্বচ্ছ হয়। প্রায়ই চালিশ্যা ধরে। তখন মনে হয়, অক্ষরগুলা বড় বড় হয় নাই কেন। নিকটদৃষ্টির কাছে অক্ষর বড় ও ছোট সবই প্রায়

সমান। কিন্তু প্রকৃতি নিকটদৃষ্টি যুবককে বার্ধক্যে কবিকথিত যন্ত্রণা দেন না। অন্যদিকে প্রতিচক্ষু নইলে চালিশ্যা-ধরার পড়া চলে না। *

বার্ধক্যে নিকটদৃষ্টির চশমা না থাকিলেও পড়িতে কষ্ট হয় না। এই আশায় নিকটদৃষ্টি যুবক সান্ত্বনা পাইতে পারে। কিন্তু এই পর্যন্ত। কারণ, যে চোখ যৌবনেই গিয়াছে, তাহা বার্ধক্যে আর আসিতে পারে না। আসে, নিকটদৃষ্টিতার উপর জরার লক্ষণ,—চালিশ্যা। যৌবনে যত নিকটে বহি পড়িতে পারা যাইত, জরাতে সে শক্তিও যায়। যৌবনের দৃষ্টির দূরসীমা বার্ধক্যে একমাত্র সীমা হয়। আর হয়, নিকটদৃষ্টি লোকের সন্তানদিগকে পিতার কর্মফল ভোগ করিতে।

* চশমা সঙ্গে না থাকিলেও চালিশ্যা-চোখে দুই এক ছত্র পড়িবার উপায় আছে। মোটা কাগজে—যেমন পোষ্টকার্ড—সূচ দিয়া একটি ছিদ্র করিয়া সেই কাগজখানিকে চশমাস্বরূপ করিতে হয়। চোখের নিকটে ছিদ্র রাখিয়া দেখিলে অক্ষর বড় দেখায়। কাজেই পড়িতে পারা যায়। বোধ হয়, এ দেশে বহু পূর্বকাল হইতে চালিশ্যার প্রতিচক্ষু নির্মিত হইয়া আসিতেছে। সেকালে উহা দুর্মূল্য ছিল, পুত্রকে পিতা বিষয়সম্পত্তির সহিত প্রতিচক্ষুও অর্পণ করিয়া যাইতেন।

১৩০৪ সালের ভূমিকম্প।

১৩০৪ সালে দেশের কি সর্বনাশই হইয়াছে! দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ছিল; তাহার উপর ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার (ইং ১৮৯৭, ১২ই জুন) অপরাহ্ণে আসামের প্রচণ্ড ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের ঈশান কোণে এমন বাড়ী ছিল না, যাহা সেই ভূমিকম্পে ভগ্ন কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। প্রায় ১২ লক্ষ বর্গ মাইল স্থানে সে কম্পন স্পষ্ট অনুভূত হইয়াছিল। গুজরাটের কিয়দংশেও সে কম্পন প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। বঙ্গোপসাগর জলময় না হইয়া স্থলময় হইলে উহারও কিয়দংশে কম্পন জানা যাইত। তিব্বত ও চীন হইতে সংবাদ পাওয়া যায় নাই; কিন্তু ঐ ঐ রাজ্যেরও কিয়দংশে কম্পন নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল। সমুদয় প্রদেশ একত্র করিলে বোধ হয়, ১৭।১৮ লক্ষ বর্গ মাইল স্থানের ভূমি কম্পিত হইয়াছিল।

ইহার তুল্য ভয়ঙ্কর ও বহু বিস্তীর্ণ ভূমিকম্পের ইতিহাস এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আসামের শিলং ও গোয়াল-পাড়া অঞ্চলে একখানি বাড়ীও রক্ষা পায় নাই। ইহার নীচে ভূত্বকের মধ্যে সংক্ষোভ উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার পশ্চিমে রংপুর ও কোচবিহার এবং পূর্বে সীলেট ছিল। ভাগলপুর, কৃষ্ণনগর, কলিকাতা, চট্টগ্রাম এই পরিধির মধ্যে প্রায় সমুদয় ইষ্টকনির্মিত গৃহাদির ক্ষতি হইয়াছিল। দক্ষিণে বিশাখাপত্তন, পশ্চিমে ভূপাল, আজমীঢ়, পাতিয়ালা, পূর্বে মন্দালয় পর্যন্ত কম্পন অনুভূত হইয়াছিল।

শিলং হইতে ভূবিদ্যা-অধিকারের স্মিথ সাহেব লিখিয়াছিলেন,—"সে সময় আমি বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম এবং শিলংএর ইস্কুলের নিকটবর্তী জলের কলের ধারে দাঁড়াইয়াছিলাম। শিলংএর সময়ের ৫টা ১৫ মিনিটের সময় মেঘনির্ঘোষের ন্যায় এক গভীর দীর্ঘ-নাদ আরম্ভ হইল।

বোধ হইল, যেন দক্ষিণে কিংবা দক্ষিণপশ্চিম হইতে আসিতেছে। ইহার পরেই কম্পন আরম্ভ হইয়াই প্রচণ্ড হইয়া উঠিল, ভূপৃষ্ঠ প্রবলবেগে দুলিতে লাগিল এবং আমাকে বসিয়া পড়িতে হইল। প্রায় এক মিনিট কাল কম্পন ছিল; এবং একই প্রকার উগ্র বোধ হইয়াছিল। সমুদ্রে জাহাজে যেমন বিবমিষা হয়, তখন সেইরূপ হইয়াছিল। মনে হইতে লাগিল, কেহ যেন মাটিটা ভীষণবেগে অগ্রপশ্চাৎ চালাইয়া দিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পথের ধারে ধারে দীর্ঘ ফাট উৎপন্ন হইল; পুষ্করিণীর ঢালু পাড় প্রায় ১০ ফুট উচ্চ ছিল, কাঁপিতে কাঁপিতে উহা পড়িয়া গেল এবং একস্থানে ফাটিয়া ফাঁক হইয়া গেল। পথের পাশে কোথাও কোথাও দুই ফুট উচ্চ আইল ছিল, সে সব নড়িতে নড়িতে পথের সমান হইয়া পড়িল। ইস্কুলের বাড়ীটি দুই এক সেকেণ্ডের মধ্যেই ভূমিসাৎ হইল এবং উপরের লোহার পাতের চাল বাঁকিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। শিলংএর নিকটবর্তী যে সকল সেতু ও পাথরের ঘরবাড়ী ছিল, প্রায় সমুদয় মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। 'কুইণ্টন' নামক কীর্তিস্তম্ভের চূড়া স্বস্থান হইতে ফুট কয়েক দূরে পূর্বোত্তর কোণে পড়িয়া গিয়াছিল। কম্পন একেবারেই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল, এবং পরে বোধ হইল দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে আসিয়াছিল।"

উক্ত ভূমিকম্পের সময় আমি হুগলি জেলার অন্তর্গত আরামবাগের নিকটস্থ এক গ্রামে ছিলাম। এই গ্রাম শিলংএর নৈর্ঋত কোণে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে অবস্থিত। গৃহ হইতে কিছু দূরে এক ফাঁকা জায়গায় উত্তরমুখে দাঁড়াইয়াছিলাম। হঠাৎ দূরে মেঘগর্জনের স্থায় এক গভীর শব্দ শুনিতে পাইয়া, চারিদিকে দেখিতে না দেখিতে ভূমি এতবেগে নড়িয়া উঠিল যে, আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না; বসিয়া পড়িলাম। বোধ হইতে লাগিল, যেন সমুদ্রে জাহাজে দুলিতেছি। সম্মুখের উন্মুক্ত ভূ-পৃষ্ঠ ঢেউ খেলিতে লাগিল; পাশের তাল-পুকুরের পাড়ের তাল গাছের মাথা ঠিক ঢেউএর মত দুলিতে

লাগিল। কিছু দূরে, একটা আটচালায় লণ্ঠন ঝুলানা ছিল; দেখিলাম উত্তরদক্ষিণে দুলিতেছে। আটচালার সম্মুখস্থ বৈঠকখানায় গিয়া দেখি, একটা ঝাড় পূর্বপশ্চিমে দুলিতেছে। সেখানে একটিমাত্র ছিল। দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম; কেন না প্রথমে মনে হইয়াছিল, কম্পন উত্তরদিক হইতে আসিয়াছিল। পরে চিন্তা করিয়া বুঝিলাম কম্পন একই দিক হইতে আসে না। পরদিন দেখিলাম, পার্শ্বস্থ দ্বারকেশ্বর নদের বালুকাময় চরে দীর্ঘ বিবর উৎপন্ন হইয়াছে, পাকা দোতলা বাড়ীর উত্তরদক্ষিণে লম্বা দিকের যাবতীয় খিলান ফাটিয়া গিয়াছে।

অনেকে এই ভূমিকম্পের বিবরণ পাঠাইয়া ছিলেন। সকলেই বলিয়াছেন, জলের যেমন তরঙ্গ হয়, ভূপৃষ্ঠেও সেইরূপ তরঙ্গ হইয়াছিল। আরও বলিয়াছেন, ভূমি উপরে নীচেও কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ঢাকের চর্মের উপর কলাই রাখিয়া ঢাক পিটিলে কলাই যেমন উপর দিকে লাফাইয়া পড়ে, পথের উপরের ইট ও পাথরের খোয়া তেমনই শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়াছিল। বিড়ালে ইঁদুরকে যেমন নাড়াচাড়া করে, এই দুই গতিবশতঃ তেমনই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল।

ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে শব্দ শোনা যায়। কিন্তু এই ভূমিকম্পে যে গভীর নিনাদ শোনা গিয়াছিল, তেমন শব্দ কদাচিৎ ঘটে। শিলংএর এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন, ৫০।৬০ হাতের মধ্যে ঘরবাড়ী পড়িতেছিল; কিন্তু ভূমিকম্প-নিনাদে বাড়ী পড়িবার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। দক্ষিণে কোকনডা, পশ্চিমে গয়া, এলাহাবাদ, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে গভীর দীর্ঘনাদ শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। রাণীগঞ্জের কয়লার খনিতে কম্পন জানা যায় নাই; কিন্তু শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। কেহ বলিয়াছেন, এই শব্দ যেন দূরস্থ মেঘগর্জনের ন্যায়; কেহ বলিয়াছেন, চলন্ত রেলগাড়ীর শব্দের ন্যায়; আর কেহ কেহ বলিয়াছেন শব্দ দীর্ঘ গভীর নহে, হ্রস্ব ও উচ্চ

যেন বন্দুকের আওয়াজ। এইরূপ শব্দও নূতন নহে। ১৮৬৯ ও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতেও বোম ফোটার মত শব্দ শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। বরিশালে কামানদাগার যে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও এই প্রকার। হয়ত এই শব্দের মূলে ভূমিকম্প।

শিলং, টুরা প্রভৃতি সংক্ষোভ-পৃষ্ঠে একদিনেই ভূমিকম্প শেষ হয় নাই; পর দিন শতাধিক বার হইয়াছিল। ইহার পরেও কয়েকদিন কম্পন চলিয়াছিল। বোরদ্বার চা-বাগানে এক গেলাস জলকে সপ্তাহ কাল নড়িতে দেখা গিয়াছিল। সাত দিন পরেও শিলংএ ভূ-কম্প হইয়াছিল।

এ গুলি উত্তর কম্প। অন্য বৎসর হইলে ইহাদের অনেকগুলি লোকে প্রবল মনে করিত। ইহাদের মধ্যে একটি ৩০শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি প্রায় দেড়টার সময়, এবং আর একটি ইহার প্রায় ১১½ ঘণ্টা পরে ঘটিয়াছিল। সংক্ষোভ-পৃষ্ঠে উভয়েই এমন উগ্র হইয়াছিল যে সেখানে ভাঙ্গিবার চূরিবার কিছু থাকিলে সমস্তই নষ্ট হইত। দুইটিই কলিকাতায় জানিতে পারা গিয়াছিল। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ১০টা ৪০ মিনিটের সময়, পুনশ্চ রাত্রি ১২টা ৪৭ মিনিটের সময় কলিকাতায় পর্যন্ত ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল। ইহার পর কম্পন হ্রাস হয়। কিন্তু, ৯ই আষাঢ় (২২শে জুন), ১৬ই আষাঢ় (২৯শে জুন) এবং পরে ১৯শে শ্রাবণ (২রা আগষ্ট), এবং আরও পরে ২৪শে আশ্বিন (৯ই অক্টোবর) কলিকাতায় কম্পন জানা গিয়াছিল। এই সকল উত্তর-ভূমিকম্প সংক্ষোভ পৃষ্ঠে ও তাহার নিকটবর্তী স্থানে অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল।

কোথায় কোন্ সময়ে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল, তাহা সূক্ষ্মরূপে না জানিলে কম্পনের গতি নিরূপণ করিতে পারা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন, ক্লক-ঘড়ির দোলকটি ভূমিকম্পের আরম্ভ সময়ে থামিয়া যায়। বস্তুতঃ তাহা নহে। দোলক যে কখন থামে তাহা ঠিক নাই। দেখা গিয়াছিল,

কলিকাতায় রেলের সময়ের অপরাহ্ন ৪ ঘণ্টা ২৭ মিনিট ৪৯ সেকেণ্ড, বোম্বাইতে অপরাহ্ন ৪ ঘ. ৩৫ মি. ৪৫ সেকেণ্ড সময়ে ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু সময় জানিলেই বেগ গণিতে পারা যায় না। কলিকাতা হইতে বোম্বাইর ব্যবধান জানা আবশ্যক। কলিকাতায় সংক্ষোভস্থল ছিল না, এবং কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্যন্ত এক ঋজু রেখায় কম্পনও ধাবিত হয় নাই। কম্পনের উৎপত্তিস্থল হইতে কলিকাতা ২৫৬ মাইল এবং বোম্বাই ১২০৮ মাইল। সুতরাং মধ্যবর্তীস্থানে মিনিটে প্রায় ১২০ মাইল বেগে কম্পন চলিয়া গিয়াছিল।

ইয়ুরোপে এই ভূকম্প প্রত্যক্ষ হয় নাই। কিন্তু যন্ত্র দ্বারা ধরা পড়িয়াছিল। ভূমির অপ্রত্যক্ষীভূত মৃদু স্পন্দন হইতে প্রত্যক্ষীভূত কম্পন এবং তাহার বেগ ও. বল নিরূপণ নিমিত্ত "ভূকম্প-লেখ" নামে যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে। ইয়ুরোপের অনেক স্থানে এই যন্ত্র আছে। ১৩০৪ সালের ভূকম্পের পর ঐ সকল যন্ত্রের লেখন আনীত হইয়াছিল। ইটালী, হলণ্ড, রুশিয়া, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড প্রভৃতি বহু দূর দেশে উক্ত ভূকম্প জানা পড়িয়াছিল। ইটালী হইতে সম্পূর্ণ লেখন পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে কম্পনের তিন দশা জানা গিয়াছে। প্রথমে ভূমির তরঙ্গ হয় নাই, পার্শ্বগতি হইয়াছিল। সংক্ষোভ-পৃষ্ঠের কম্পনের প্রায় সাড়ে বার মিনিট পরে ইটালীতে ঐ গতি লক্ষিত হইয়াছিল। ঐ গতি থাকিতে থাকিতে প্রায় সাড়ে আট মিনিট পরে দ্বিতীয় দশা উপস্থিত হয়। এই কম্পন বৃহৎ এবং ইহাতে ভূমির উন্নমন ও অবনমন স্পষ্টতঃ লক্ষিত হইয়াছিল। শেষে প্রায় ২০ মিনিট পরে তৃতীয় দশা ঘটে। ইহাতে সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় ভূমির মৃদু তরঙ্গ দেখা গিয়াছিল। এই দশা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল এবং কোন কোন যন্ত্রে দুই তিন ঘণ্টা পর্যন্ত কম্পন চলিয়াছিল।

ভূকম্পের দ্বিতীয় দশাটি পূর্বে জানা ছিল না। তৃতীয় দশায় ভূপৃষ্ঠ

দিয়া কম্পন সর্বত্র একই বেগে ধাবিত হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, সংক্ষোভ-পৃষ্ঠ হইতে তরঙ্গ উৎপন্ন এবং ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া পূর্ব পশ্চিমে সংক্ষোভ-পৃষ্ঠের ঠিক বিপরীত স্থানে আবার একত্র হইয়াছিল। এখানে তরঙ্গগুলি পরস্পর ছেদ করিয়া পূর্বদিকের তরঙ্গ পশ্চিমদিকে এবং পশ্চিম দিকের পূর্বদিকে যাইতে যাইতে পুনর্বার একত্র হইয়াছিল। এই তথ্য এই ভয়ঙ্কর ভূকম্পে প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের রেলের ঘড়ির অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট সময়ে এডিনবরায় প্রথম কম্পন এবং তাহার ৩ ঘণ্টা ১ মিনিট পরে দ্বিতীয় কম্পন জানা গিয়াছিল। সংক্ষোভ-পৃষ্ঠ হইতে এডিনবরা, ভূপৃষ্ঠ দিয়া প্রায় পাঁচ হাজার মাইল। সেখানে প্রথমে ভূকম্প যে বেগে গিয়াছিল, পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া প্রায় বিশ হাজার মাইল ঘুরিয়া সেই বেগে আসিয়াছিল।

ভূকম্পন-গতির বিশেষ আছে। উহা চারিদিকে যেমন ব্যাপ্ত হইতে থাকে, উহার স্থিতিকাল প্রথমে বাড়িয়া পরে কমিয়া যায়। এই ভূকম্পের সংক্ষোভ-পৃষ্ঠের মধ্যে কম্পন দুই মিনিটের অধিক স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু, কলিকাতায় পাঁচ-ছয় মিনিট, পাঁচ শত মাইল দূরে প্রায় সাত মিনিট, এবং পরে কমিতে কমিতে আমেদাবাদে দুই এক সেকেণ্ড মাত্র ছিল।

আঘাত কিংবা সংক্ষোভ ঘটিলে ভূমি কাঁপিয়া উঠে এবং তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। পাহাড় ধ্বসিয়া পড়িলে, ঘর পড়িয়া গেলে, খনি ফাটিয়া উঠিলে, বারুদ-খানায় আগুন লাগিলে চারিদিকের ভূমি কাঁপিয়া উঠে। এই প্রকার আঘাত বা সংক্ষোভ ভূমির পৃষ্ঠে ঘটে। ভূকম্প বলিলে কিন্তু এই কম্পন বুঝায় না। পৃথিবীর অভ্যন্তরে নৈসর্গিক কারণ বশতঃ সংক্ষোভ জন্মিলে যে কম্পন অনুভূত হয়, তাহাকেই ভূকম্প বলে।

নৈসর্গিক কারণ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) ভূগর্ভস্থ গহ্বরের ছাদ ও পার্শ্বের পতন বশতঃ ভূমি কাঁপিয়া উঠে। এই কম্পন কিন্তু

হয়। উহার শব্দ মাত্র শোনা যাইতে পারে, কম্পন প্রত্যক্ষ হয় না। (২) আগ্নেয় গিরির উৎক্ষেপের সময় ভূমি কাঁপিয়া উঠে। ভূপৃষ্ঠ-নিম্নে জলীয় বাষ্প হঠাৎ উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘ বিবর পথে বহির্গমনের চেষ্টাতেও ভূকম্প হয়। কিন্তু এইরূপ ভূকম্প বহুদূরে অনুভূত হয় না। (৩) যে সকল ভূকম্প প্রচণ্ড, বহুদূর ব্যাপ্ত হইতে দেখা যায়, সে সকলের কারণ অন্যবিধ। মনে কর খিলানের উপর বাড়ীর ছাদ আছে। ছাদের ভার-বশতঃ খিলানটির মধ্যস্থলে ফাটিয়া ভাঙিয়া পড়িবার আশঙ্কা হয়। কিন্তু খিলানটি না ফাটিয়া উহা কর্ষণ অবস্থায় থাকে এবং সেই অবস্থায় বহুকাল থাকিতে পারে। ভূপৃষ্ঠের নিম্নে কোন কোন স্থান এই প্রকার কর্ষণে থাকে। সেই কর্ষণের হঠাৎ বিরাম হইলে ভূকম্প হয়। আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপ চেষ্টায় কর্ষণ হঠাৎ উৎপন্ন হয়। প্রকৃত ভূকম্পে সঞ্চিত কর্ষণ হঠাৎ নষ্ট হয়। সুতরাং উভয়ের কারণে বিস্তর প্রভেদ।

ভূবিদ্যায় দেখা যায় যে, ভূত্বকের স্তর সমূহ কদাচিৎ সমতল আছে, কোথাও মাঝে এমন ভাঙিয়া গিয়াছে যে এক পাশ হইতে অন্য পাশ শত বা সহস্র ফুট উপরে উঠিয়া পড়িয়াছে। কোথাও বাঁকিয়া গিয়াছে, কোথাও কুঞ্চিত হইয়াছে। সমান হইয়া পূর্বে যতখানি স্থানে বিস্তৃত ছিল, এইরূপ বক্রণ ও কুঞ্চনের ফলে হয় ত তাহার অর্ধেক স্থান অধিকার করিয়াছে। অবশ্য প্রচণ্ড বল ব্যতীত ভূত্বকের এইরূপ বিষমতা ঘটে নাই। যেখানে প্রস্তর সমধিক দৃঢ়, সেখানে সেই বল বশতঃ তাহাতে কর্ষণ জন্মিয়াছে। সেই কর্ষণের হঠাৎ লোপে ভূ কম্পিত হইয়া উঠে।

ভূগর্ভের নিসর্গ চিরকাল অজ্ঞাত! তথাপি বোধ হয়, পৃথিবীর অভ্যন্তর অত্যন্ত উষ্ণ। উপরের কিয়দংশ প্রায় এক প্রকার উষ্ণ দেখা যায়। সুতরাং তাপ বিকিরণ-বশতঃ এখানে আর সঙ্কোচন হইতেছে না। কিন্তু, ইহার নীচের প্রস্তর সমূহ এখনও শীতল হয় নাই। সেখান হইতে তাপ

বিকিরণ হইতেছে এবং শীতল হইয়া সে সকল প্রস্তর ক্রমশঃ হ্রস্ব হইয়া পড়িতেছে। ফলে উপরের শীতল অংশ যেন খিলানের উপর রহিয়া নিরালম্ব হইয়া আছে। কাজেই ভূত্বকের স্থানে স্থানে কর্ষণ ঘটিয়াছে। ইহার প্রকৃত কারণ অত্যন্ত জটিল। কিন্তু, শেষ ফল, ভূত্বকের বিদারণ। বিদারণও এক প্রকার নহে। বিদীর্ণ প্রস্তরের উর্ধ্বাধঃ অংশদ্বয় স্খলিত কিংবা এক অংশের উপরে অপরটি অপসৃত হইতে পারে। এইরূপে ভূত্বকের নব সংস্থান হয় বলিয়া জাত ভূকম্পকে সাংস্থানিক ভূকম্প বলা যায়। ইহার সহিত আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপের কোন সম্বন্ধ নাই। ১৩০৪ সালের ভূকম্পের পর আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে কালে আসাম ও উত্তর বঙ্গে আগ্নেয়গিরি উৎপন্ন হইবে। বর্তমান জ্ঞানে বলা যাইতে পারে এরূপ আশঙ্কা অমূলক।

১৩০৪ সালের ভূকম্পে এত বহুস্থানে ভূপৃষ্ঠের এত স্থায়ী বিদারণ দেখা গিয়াছে যে, বোধ হয় ভূত্বকের বিদীর্ণ অংশদ্বয়ের একটি অপরের উপরে সরিয়া পড়িয়াছে। তাহাও বোধ হয়, এক ক্ষুদ্র স্থানে না হইয়া বহুস্থানে ঘটিয়া অনেক ভূকম্প যুগপৎ উৎপন্ন হইয়াছিল, কিংবা গভীর স্থানের এক সংক্ষোভস্থল হইতে শাখা প্রশাখা বহির্গত হইয়াছিল। ভূপৃষ্ঠ হইতে কত নিম্নে সংক্ষোভ-স্থল ছিল, কম্পনের বেগ হইতে তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায়। বোধ হয়, ভূপৃষ্ঠ হইতে পাঁচ মাইলের মধ্যেই সংক্ষোভ ঘটিয়াছিল।

বাস্তবিক ভূপৃষ্ঠ যে পার্শ্বদিকে বিচলিত হইয়াছিল, তাহা নানা লক্ষণে জানা গিয়াছে। পূর্বে খাসিয়া পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের যে পরস্পর স্থিতি ছিল ভূকম্পের পর তাহার প্রভেদ ঘটিয়াছে।

ভূকম্পের পূর্ব-বর্ণিত গতি স্মরণ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, সংক্ষোভ-পৃষ্ঠের উপরিস্থিত বড় বড় বাড়ী ভূকম্পে কখনই স্থির থাকিতে পারে না। ভূকম্প প্রচণ্ড হইলে নিশ্চয়ই সে সকল ভূমিসাৎ হইবে। দূরবর্তী কলিকাতায় অনেকবাড়ী ফাটিয়া গিয়াছিল। বাড়ী ফাটিবার অনেক

কারণ ছিল। তন্মধ্যে বাড়ীর নির্মানক্রম প্রধান। যে বাড়ীর সম্মুখে এবং পশ্চাতে খোলা বারাণ্ডা থাকে, সে বাড়ীর সমুদয় ভাগ সমান ভাবেই দৃঢ় কিংবা উচ্চ হয় না। সুতরাং ভূকম্পে যখন বাড়ীটি দুলিতে থাকে তখন তাহার উক্ত তিন অংশ সমানবেগে দোলে না। কোন অংশ অধিক দূরে, কোন অংশ অল্পদূরে যাইতে থাকে, এবং একবার নিকটস্থ ও একবার দূরস্থ হইলে তিন অংশের মধ্যে দুইটা ফাট উৎপন্ন হয়। যে বাড়ীর মধ্যের গৃহগুলি ও বারণ্ডার ছাদের কড়ি একই দিকে উত্তর দক্ষিণে ছিল, সে বাড়ী অধিক ফাটে নাই। কিন্তু যে বাড়ীর ঘরের কড়ি পূর্বপশ্চিমে এবং বারাণ্ডার কড়ি উত্তর দক্ষিণে ছিল, সে বাড়ী অধিক ফাটিয়াছিল। অবশ্য যে বাড়ী যত উচ্চ, সে বাড়ী পড়িয়া যাইবার আশঙ্কাও তত। উচ্চ অংশ যতদূর নড়ে, নিম্ন অংশ ততদূর নড়ে না। ভূমির পৃষ্ঠভাগেই কম্পন থাকে। জাপানে দেখা গিয়াছে, ২০ ফুট নীচেই উহা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। জড় বস্তুর প্রধান ধর্ম, তাহার নিশ্চেষ্টতা ; তাহাকে যেখানে রাখ, সেখানেই থাকিতে চায়; দোলাইয়া দাও, দুলিতেই থাকে। এই কারণে সবলের সহিত দুর্বলের, দৃঢ়ের সহিত অদৃঢ়ের, কঠোরের সহিত কোমলের যোগ কখনও স্থায়ী হয় না। একটি নড়িলে অপরটি তেমনি বেগে নড়ে না। কাজেই যোগস্থল বিয়োগে পরিণত হয়।

যদি ভূপৃষ্ঠের সকল স্থলের মৃত্তিকা সমান দৃঢ় বা সমান শিথিল হইত, যদি উপরের ও নীচের মৃত্তিকা এক প্রকার হইত, তাহা হইলে লম্বা ফাট সহজে উৎপন্ন হইত না। মনে কর, কোন স্থান দিয়া নদী গিয়াছে এবং তাহার পাড় শিথিল বালুকা বা মৃত্তিকার স্তরের উপরে আছে। ভূকম্পের সময় যখন উহার পাড় একবার নদীর দিকে এবং একবার ডাঙ্গার দিকে নড়িতে থাকে, নীচের মৃত্তিকা অসংহত বলিয়া নদীর সমান্তরে পাড়ে ফাট উৎপন্ন হইবে। অর্থাৎ ভূমির পার্শ্বগতির ফলে বিবরের উৎপত্তি।

কিন্তু এই গতি হেতু নীচের জল ও বালুকা উৎক্ষিপ্ত হইতে পারে না। এজন্য ভূমির উর্ধ্বাধঃগতি আবশ্যক। উল্লিখিত শিথিল স্তরের নীচের স্তর যদি উপর দিকে আসিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে উপরের স্তর দৃঢ় হওয়াতে আসিতে পারিবে না। কিন্তু শিথিল স্তরটি উপরে ও নীচে চাপ পাইতে থাকিবে। ফলে শিথিল স্তর পর্যন্ত ফাট থাকিলে সেই ফাট দিয়া জল ও বালুকা বহির্গত হইতে থাকিবে। কোন পদার্থ একবার বহিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে তাহার স্রোত শীঘ্র বন্ধ হয় না। কাজেই ভূকম্পে ভূপৃষ্ঠের উর্ধ্বাধঃ গতি সবিরাম হইলেও বালুকা নির্গমন অবিরাম হইতে থাকে।

এই ভূকম্পে আর এক প্রকার বিবর উৎপন্ন হইয়াছিল। খাসিয়া ও গারো পাহাড়ের পাদ পর্যন্ত স্থানে স্থানে পলিমাটি বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ভূকম্পের পর পাদদেশের পরেই ১০।১২ হাত বিস্তৃত নালা হইয়া সেখানকার মাটি বাঁধের মতন হইয়া পড়িয়াছিল। পাহাড় ও সমস্থল পরস্পর পুনঃ পুনঃ ঠেল পাইয়া পাদদেশের মৃত্তিকা সরিয়া পড়িয়াছিল।

আসাম-বেঙ্গাল রেলপথের ধারে যে সকল টেলিগ্রাফ তারের খুঁটি ছিল, ভূকম্পের পরে তাহাদের অনেকগুলি পূর্বের রেখায় না থাকিয়া ৭।৮ হাত দূরে সরিয়া গিয়াছিল। হয় ত নীচে শিথিল মৃত্তিকা ছিল, তাহার উপর দিয়া উপরের মৃত্তিকা ও খুঁটি সরিয়া গিয়াছিল। এইরূপ, ভূপৃষ্ঠের পার্শ্ব গতিহেতু রেলপথের লৌহ রেল বাঁকিয়া ও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ঐ গতির সহিত উর্ধ্বাধঃ গতি যুক্ত হইলে অন্যবিধ ফল ঘটে। কোন কোন স্থানের কূপ, পুষ্করিণী ও নদীর গর্ভ উচ্চ হইয়াছিল। বালুকার উৎক্ষেপে কূপাদি পূর্ণ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাই একমাত্র কারণ নয়। কোন কোন নদীর উপরে বাঁশের সেতু ছিল। দেখা গিয়াছে, মাঝের খুঁটি উপরদিকে উঠিয়া পড়িয়াছে। অতএব নদীর গর্ভই উপরে উঠিয়াছিল।

ভূকম্পের আর এক নৈমিত্তিকের উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাব শেষ করা যাইতেছে। চেরাপুঞ্জী, শিলং, গৌহাটী, তেজপুর, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানে যে স্তম্ভ যে দিকে ছিল, ভূকম্পে তাহা ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৯০ অংশ বামে বা দক্ষিণে ঘুরিয়া গিয়াছিল। তেজপুরে একটা লোহার ছোট সিন্দুক কাঠের চৌকির উপর ছিল; ভূকম্পে তাহা বামদিকে ৪০ অংশ ঘুরিয়া গিয়াছিল। ভূকম্পে স্তম্ভাদির এইরূপ আবর্তন অন্য ভূকম্পেও লক্ষিত হইয়াছিল। অতএব ভূকম্পে পৃষ্ঠভূমির ঘূর্ণন স্বীকার করিতে হইতেছে। ভূকম্পের সংক্ষোভ একই দিক হইতে আসিলে পৃষ্ঠভূমি ঘূর্ণিত হই এবং বিভিন্ন দিক হইতে আসে বলিয়া পৃষ্ঠভূমির আবর্তন ঘটে। অবশ্য

এদেশে খ্রীষ্টের উনবিংশ শতাব্দীতে ১৮০৩, ১৮১৯, ১৮৩৩, অংশ ১৮৬৯, ১৮৮১, ১৮৮৫ এবং ১৮৯৭ অব্দে বঙ্গ আসাম ও বিহারে উগ্র ভূকম্প হইয়াছিল। ১৮৪২, ও ১৮৭৮ অব্দে কাশ্মীর প্রদেশে দুইবার হইয়াছিল। অতএব গত শত বৎসরের মধ্যে এদেশে দশবার উগ্র ভূকম্প হইয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের দুইটি ছাড়িয়া দিলে অপর ৮টির সংক্ষোভ-পৃষ্ঠ আসাম হইতে পাটনার মধ্যে ছিল। ১৮৮১ অব্দের ভূকম্পের সংক্ষোভ-পৃষ্ঠ বঙ্গোপসাগরে এবং ১৮১৯ অব্দের মালব প্রদেশে ছিল। কিন্তু, কোনটির দক্ষিণাপথে কিংবা পশ্চিমভারতে ছিল না। মধ্যভারতে একটিমাত্র ছিল। অতএব বোধ হইতেছে ভূগর্ভের যে নিসর্গবশতঃ দক্ষিণাপথের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার বিরাম হইয়াছে। কিন্তু, যদ্দ্বারা হিমালয়ের ও আসামের পাহাড়ের উৎপত্তি, তাহার এখনও হয় নাই। বঙ্গদেশকে এখনও অনেকবার কম্পিত হইতে হইবে। উক্ত ভূকম্পের সংক্ষোভস্থল লক্ষ্য করিলে বোধ হয় যেন উহা পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে। আসামের পাহাড়গুলিও তেমন পুরাতন নহে। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণদিকের পাহাড়গুলিতে তাহাদের ত্রিবিধ অবস্থা দেখিতে পাওয়া

যায়। প্রথমে যে পুরাতন পৃষ্ঠ ছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই; সে পুরাতন পৃষ্ঠ লইয়া ভূত্বক্ উদ্‌গত হইয়া পাহাড় হইয়াছে। কিন্তু সর্বত্র সমভাবে না হওয়াতে এখানে ওখানে বিদীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; ইহা পাহাড়গুলির দ্বিতীয় অবস্থা। তারপর নদীর দ্বারা উহাদিগের তৃতীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। যখন প্রথম অবস্থার লক্ষণ এখনও লুপ্ত হয় নাই, তখন উহাদিগের বয়ঃক্রমও অধিক নয়। যে কারণে উহাদের উৎপত্তি সে কারণেরও অবসান হয় নাই। এই লক্ষণেও বোধ হয়, পূর্ববঙ্গ ও আসামের ভাগ্যললাটে এখনও অনেক বিপত্তি লিখিত আছে।

সমাপ্ত।